৯-১০
দুই খন্ড একত্রে
সর্বহারা
মনিরা
রোমেনা আফাজ
বেলাল
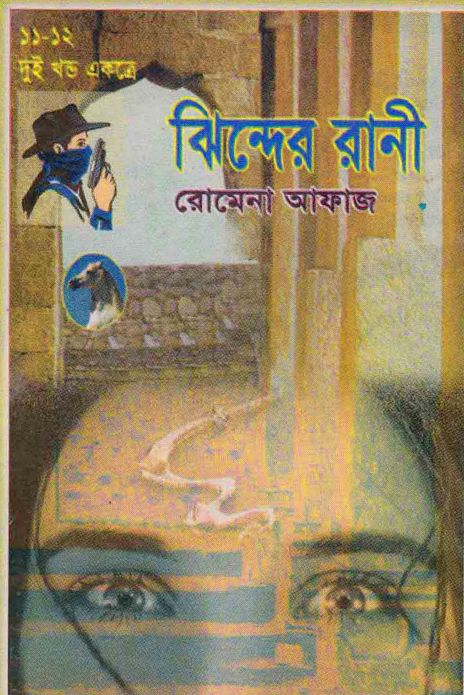
দস্যু বনহুর সিরিজ

দুই খণ্ড একত্রে

সর্বহারা মনিরা-৯
ঝিন্দ শহরে দস্যু বনহুর-১০

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

সর্দার, একি হল আপনার? সারা দিনরাত ধ্যানগ্রস্তের মত এমনি করে বসে বসেই কাটাবেন? এখন রাত দ্বিপ্রহর। চলুন, শোবেন চলুন। রহমান বিনীত কণ্ঠে দস্যু বনহুরকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলল।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল— রহমান, এই গভীর রাতে গহন বনে করুণ সুরে কে কাঁদে?

সর্দার, আপনি ফিরে আসার পর কারও সঙ্গে কোন কথা বলেননি, কারও কথা জিজ্ঞাসাও করেননি। আপনার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর নূরী পাগল হয়ে গেছে।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করে উঠল— নূরী পাগল হয়ে গেছে! কই, একথা তো তুমি আমাকে বলনি!

আপনি তো কিছুই জানতে চাননি?

নূরী আমার মৃত্যু সংবাদে পাগল হয়ে গেছে! আর তাকে তোমরা এভাবে ছেড়ে দিয়ে রেখেছ।

সর্দার, তাকে আমরা অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারিনি। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন সে এমনি করে বনে বনে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়ায়। সর্দার আশ্চর্য কোন হিংস্র জন্তু তাকে আজও খায়নি। কত বর্ষার পানি, কত রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপ্রহর কেটে গেছে তার মাথার ওপর দিয়ে, তবু সে ফিরে আসেনি!

বলো কি রহমান !

হ্যাঁ সর্দার।

উঠে দাঁড়াল বনহুর— চলো, ওকে ফিরিয়ে আনি রহমান।

চলুন সর্দার।

বনহুর আর রহমান আস্তানা ছেড়ে বনে প্রবেশ করল রহমানের হাতে জ্বলন্ত মশালের উজ্জ্বল আলোতে চারদিকে লক্ষ্য রেখে এগুতে লাগল ওরা দু'জন।

কিছু পূর্বে দস্যু বনহুরের কানে করুন একটা কান্নার সুর ভেসে এসেছিল। কোনদিক থেকে শব্দটা এসেছিল ঠিক বুঝতে পারেনি বনহুর, তাই এদিক সেদিক খুঁজতে লাগল রহমান আর সে।

গোটা বনে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও নূরীর সন্ধান না পেয়ে বিমর্ষ মনে এগুলো বনহুর ও রহমান। হঠাৎ মশালের আলোতে ঝর্ণার দিকে দৃষ্টি চলে যায় ওদের।

থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠল রহমান— সরদার, ঐ যে নূরী!

বনহুর কোন কথা না বলে স্থিরচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। অদ্ভুত এ দৃশ্য! ঝর্ণার দিকে মুখ করে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত বসে আছে নূরী।

বনহুর পা বাড়াল নূরীর দিকে।

রহমান মশাল হাতে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর ততক্ষণে নূরীর পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটা পাথরখণ্ডে বসেছিল নূরী, বনহুর ওর পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রাখল।

ধীরে ধীরে ফিরে তাকাল নূরী।

রহমানের হাতের মশালের আলোতে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল বনহুর— নূরীর একি চেহারা হয়েছে! রুক্ষ এলায়িত চুল, কোটরাগত চোখ, শুষ্ক গণ্ডদ্বয়। বনহুর আর নূরী কিছুক্ষণ উভয়ে তাকিয়ে রইল উভয়ের দিকে। বনহুরের চোখে মুখে রাজ্যের ব্যাকুলতা আর নূরীর দৃষ্টি উদাস, ভাষাহীন।

নূরীর এই চেহারা বনহুরের মনে দারুণ আঘাত করল, কিছুক্ষণ কোন কথা তার মুখ দিয়ে বের হল না। চোখ দুটো শুধু অশ্রু ছলছল হয়ে উঠলো। এবার বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল—নূরী!

নূরী নিশ্চল স্তব্ধ নয়নে তাকিয়ে ছিল, সে বনহুরকে চিনতেই পারেনি। রহমানের মশালের আলোতে তাকিয়ে দেখছিল, বনহুরের ডাকে চমক ভাঙে, ঠোঁট দু'খানা কেঁপে ওঠে একটু— বলতে পারে না কিছু।

বনহুর পুনরায় বলে উঠল—নূরী আমায় তুমি চিনতে পারছনা?

এতক্ষণে নূরী কথা বলে— কে তুমি?

নূরীর কণ্ঠ স্বরে খুশি হয় বনহুর, বলে— আমি তোমার হুর!

তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল নূরী—না, না, না, সে বেঁচে নেই, সে বেঁচে নেই। বেঁচে নেই -- দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল নূরী।

রহমান বলল— সর্দার, চলে আসুন। আজ হঠাৎ ও আপনাকে চিনতে পারবে না। আসুন সর্দার।

বনহুর কিছুক্ষণ নূরীর দিকে তাকিয়ে থেকে ফিরে দাঁড়াল— চলো রহমান।

আস্তানায় ফিরে এসে বনহুর অন্তরে অসহ্য ব্যথা অনুভব করতে লাগল কিছুতেই সে স্বস্তি পেল না।

গোটা রাত পায়চারী করেই কাটিয়ে দিল বনহুর।

ভোরের আলোতে পৃথিবী ঝলমল করে উঠল। গাছে গাছে পাখির কলরবে মুখর হল। সোনালী সূর্যের আলো এসে পৌঁছল বনহুরের আস্তানার গোপন কক্ষের চোরা শার্সি দিয়ে।

বনহুর কলিংবেলে হাত রাখতেই দু'জন অনুচর কক্ষে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানাল।

বনহুর বলল— রহমানকে ডাক।

বেরিয়ে গেল অনুচরদ্বয়। একটু পরে কক্ষে প্রবেশ করল রহমান, কুর্ণিশ জানিয়ে নতমস্তকে দাঁড়াল—সর্দার!

বনহুর রহমানের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

রহমান বনহুরের চোখের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরতেই চমকে উঠল, আশ্চর্য হয়ে বলল—সর্দার, সারারাত আপনি ঘুমান নি? চোখ দুটো যে আপনার জবাফুলের মত লাল হয়ে গেছে!

বনহুর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কি যেন চিন্তা করল, তারপর বলল— রহমান, নূরীকে আস্তানায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর।

রহমান বলে উঠল—সর্দার, অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।

যাও আবার চেষ্টা কর।

বেশ যাচ্ছি। কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেল রহমান।

প্রহর কয়েক পর ফিরে এলো রহমান, মুখমণ্ডল বিষণ্ন, মলিন। শরীরে কয়েক স্থানে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে।

বনহুর বলল— একি! নূরী এলো না।

না, সর্দার। এই দেখুন— আমি ওকে জোর করে নিয়ে আসার চেষ্টা করলে ও আমাকে ঢিল মেরে আর কামড়ে এই অবস্থা করে দিয়েছে।

বনহুর কিছুক্ষণ স্থিরচোখে রহমানের দিকে তাকিয়ে বলল— আচ্ছা যাও, আমি নিজে ওকে ফিরিয়ে আনছি। বনহুর কথা শেষ করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘন বনের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলল বনহুর। মনে তার নানা চিন্তা। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া যেন তার জীবনটাকে একেবারে ওলট পালট করে দিয়ে গেছে। কি যেন ছিল, কি যেন নেই, কি যেন হারিয়ে গেছে। অভিশপ্ত জীবন বনহুরের, তাই তার জীবনে এত দুর্যোগের ঘনঘটা।

কিছুদূর এগুতেই দেখতে পেল অদূরে একটা গাছের তলে বসে কি যেন ভাবছে নূরী। হাতে তার এলোমেলো গাঁথা একটি ফুলের মালা। আর সম্মুখে পড়ে রয়েছে কয়েকটা পাথরের ঢিল।

বনহুর বুঝতে পারল, আবার যদি নূরীকে কেউ বিরক্ত করে তাই সে আগে থেকেই প্রস্তুত রয়েছে।

বনহুর কোন রকম শব্দ না করে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

নূরী ধ্যানগ্রস্তের মত বসেছিল, সম্ভবতঃ ফুলের মালাটাই বসে বসে গাঁথছিল সে, অর্ধেকটা গাঁথার পর কি বুঝি ভেবে কিছু ফুল ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলেছে আশে পাশে।

বনহুর একটা বড় ধরনের ফুল হাতে তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল নূরীর সম্মুখে— নাও।

নূরী চোখ তুলে তাকালো, কিছুক্ষণ স্থির নয়নে চেয়ে থেকে হঠাৎ একটা ঢিল তুলে ছুড়ে মারলো বনহুরের মাথা লক্ষ্য করে।

বনহুর একটুও সরলো না বা নড়লো না। ঢিলটা বনহুরের মাথায় লেগে কিছুটা কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

বনহুর স্থিরভাবে তবু দাঁড়িয়ে আছে। ফুলটা তখনও বনহুরের হাতের ফাঁকে।

নূরী আর একটা ঢিল তুলে পুনরায় যেমনি বনহুরের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়তে যাবে অমনি বনহুর প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল নূরীর গালে। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত থেকে ঢিলটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে দিল দূরে।

নূরীকে এভাবে আঘাত করে বনহুর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না, ওকে টেনে নিল কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ডাকল ---- নূরী নূরী------বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো বনহুরের কণ্ঠ।

বনহুরের প্রচণ্ড চড়ে নূরী হতভম্বের মত চেয়ে রইলো ওর দিকে। উঃ বা আঃ কিছুই বলল না কিংবা কান্নায় ভেঙে পড়ল না।

বনহুর ওকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

নূরী এতক্ষণও হাতের মালাটা মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছিল। বনহুর ওর সম্মুখে বসে গলাটা বাড়িয়ে দিল— দাও।

নূরী স্থির নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে, মালাটা দেবে কিনা ভাবছে— কিংবা ভাবছে যে তাকে এমনভাবে আঘাত করতে পারে তাকে আবার মালা দেবে। হঠাৎ নূরী মালাটা পরিয়ে দিল বনহুরের গলায়।

বনহুর ওকে নিবিড় করে টেনে নিল কাছে, ডাকল—নূরী!

নূরী কিন্তু অবাক হয়ে বারবার তাকাচ্ছে বনহুরের মুখের দিকে। হয়তো স্মরণ করতে চেষ্টা করছে কখনও কোথাও একে দেখেছে কিনা। বনহুরের ললাটে গড়িয়ে পড়া রক্তের দিকে তাকিয়ে নূরী হঠাৎ নিজের চোখ দুটো হাত দিয়ে ঢেকে ফেলল, তারপর আংগুলের ফাঁক দিয়ে বনহুরের কপালের রক্ত লক্ষ্য করে শব্দ করল—ইস।

বনহুর বুঝতে পারলো নূরীর একটু একটু জ্ঞান হচ্ছে। আশায় আনন্দে বনহুরের নিরাশ হৃদয় ভরে উঠলো। নূরীর মঙ্গল চিন্তাই এখন তার একমাত্র কামনা। যা ছিল সব হারিয়ে ফেলেছে সে। সিন্ধী নদীতে তার জীবন সঙ্গিনী মনিরাকে বিসর্জন দিয়েছে। বনহুর এখন সর্বদা মনিরার স্মৃতি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। যতক্ষণ মনিরাকে ভুলে থাকে ততক্ষণ তার মনে কিছুটা শান্তি থাকে। ওর কথা স্মরণ হতেই বিষিয়ে ওঠে অন্তরটা— অসহ্য ব্যথার কাঁটা খোচা দিয়ে চলে তখন ওর হৃদয়ে। তার মনিরা ব্যাভিচারিণী-----অসতী----যখনই এই চিন্তা বনহুরকে অস্থির বিচলিত করে তোলে তখনই সে নিজের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়। ভুলে থাকতে চায় পুরোন স্মৃতি।

একদিন অবিরত ভেবেছে বনহুর, শুধু একমাত্র মনিরার কথাই সে ভেবেছে সর্বক্ষণ। ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা পায়নি—একটা অসহ্য যন্ত্রণা তার সমস্ত অন্তরকে দগ্ধীভূত করে দিয়েছে, তাই বনহুর আজ অন্য চিন্তায় মগ্ন থাকতে চায়— নিজকে ভুলিয়ে রাখতে চায়, এমন সময় নূরীর পুনঃ আবির্ভাব বনহুরের জীবনে আনে অভাবনীয় একটা পরিবর্তন। দস্যু বনহুর একটা নতুন আলোর সন্ধান লাভ করে তার জীবনে। সত্যি নূরী

তাকে কত---- ভালবাসে বনহুর নূরীর মুখখানা তুলে ধরে বলে— নূরী, আমি মরিনি; আমি মরিনি। চেয়ে দেখ আমি তোমার হুর।

নূরী এবার গভীর মনোযোগ সহকারে তাকাল— কতক্ষণ কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হল না। হঠাৎ এবার বলে উঠল— তুমি বেঁচে আছ?

হ্যাঁ— হ্যাঁ নূরী আমি— আমি তোমার— বল—বল তুমি কে? বল -বল---

নূরী হাঁপাতে শুরু করলো—কিছু বলতে চাইল কিন্তু বলতে পারছে না।

বনহুর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল, বলল—দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখো, বল--- বল--- একবার নাম ধরে ডাকো নূরী।

এবার নূরী অস্ফুট শব্দ করে উঠল—হুর!

নূরী! আবেগভরে বনহুর টেনে নিল নূরীকে!

এতক্ষণ নূরী চিনতে পেরেছে বনহুরকে। নূরী বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলল তুমি বেঁচে আছ! তুমি মরে যাওনি?

না, না নূরী আমি মরে যাইনি।

কিন্তু ওরা যে বলেছিল---

ওরা জানতো না।

বড় শয়তান ওরা। দেখ হুর আমাকে ওরা—

হ্যাঁ—নূরী ওদের আমি ভীষণ শাস্তি দেব। চল ঘরে চল নূরী—বনহুর নূরীর হাত ধরে নিয়ে চলল।

নূরী ব্যথাকরুণ সুরে বলল— আবার তো চলে যাবে না?

না নূরী, আর তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

বনহুরের হাত ধরে নূরী আস্তানায় প্রবেশ করল।

❑

হতবাক স্তম্ভিত মনিরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে ভূলুণ্ঠিত শয়তান মুরাদের রক্তমাখা দেহখানা। কোলে শিশুপুত্র নূর। তখনও মনিরার

দৃষ্টি ওদিকের মুক্ত জানালার দিকে, যে পথে একটু পূর্বে তার চির আকাঙ্ক্ষিত প্রাণাধিক স্বামী দস্যু বনহুর অন্তর্ধান হয়েছে।

মুরাদের আর্তচিৎকারে কক্ষটি তখন লোকজনে ভরে উঠেছে। সকলের চোখে মুখেই আতঙ্কের ছাপ। কেউ কেউ চিৎকার করে বলছে খুন, খুন, খুন—

অল্পক্ষণেই পুলিশ এসে হাজির হল সেখানে।

হোটেলের সবাই জানত মনিরা মুরাদের স্ত্রী। ঐ রকমই পরিচয় দিয়েছিল মুরাদ হোটেলের মালিকের কাছে এবং আসল নাম পালটে নিজের নাম শাহ হোসেন এবং মনিরার নাম মর্জিনা হোসেন রেখেছিল।

এক্ষণে শাহ হোসেনের মৃত্যুতে হোটেলের মালিক ভয়ে মুষড়ে পড়ল। তার হোটেলে খুন!—এটা হোটেলের বিরাট একটা বদনাম।

হোটেলের মালিক কম্পিত কণ্ঠে বলল— মিসেস হোসেন, কে আপনার স্বামীকে হত্যা করেছে বলতে পারেন? কে এসেছিল এখানে?

কিন্তু কি আশ্চর্য, শাহ হোসেনের স্ত্রীর চোখে এতটুকু পানি নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে—ব্যাপার কি, হোটেলের সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

পুলিশ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করে চলল— আপনার স্বামী কিভাবে নিহত হলেন আমরা জানতে চাই। কে তাঁকে হত্যা করল আপনি নিশ্চয়ই তা জানেন? আপনি যদি আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে পাকড়াও করে শাস্তি দিতে চান তবে আমাদের নিকটে কোন কথাই গোপন করবেন না।

এত কথার পরও মনিরা নীরব! একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না। কিন্তু এভাবে নিশ্চুপ থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, পুলিশ তাকে অন্যভাবে সন্দেহ করতে পারে। তাই বলল মনিরা—কে ওকে হত্যা করেছে আমি জানি না।

পুলিশ ইন্সপেক্টার রাগত কণ্ঠে বলেন— আপনার সামনে আপনার স্বামীকে হত্যা করা হল অথচ আপনি জানেন না? এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

মনিরা আবার বলল— ওকে যে হত্যা করেছে তাকে আমি দেখেছি কিন্তু চিনি না।

সেদিন এর বেশি কিছু প্রশ্ন না করে লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ ইন্সপেক্টার বিদায় গ্রহণ করলেন।

হোটেলের মালিক নিজে মনিরার দায়িত্বভার গ্রহণ করল।

পরদিন পুনরায় পুলিশ এলো, মনিরাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন—আচ্ছা লোকটাকে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন মিসেস হোসেন?

মনিরা বললো— দেখেছি।

ওর চেহারা কেমন ছিল?

মুখে চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ী, গালপাট্টা বাঁধা, চোখে হিংস্র চাউনি--

এর পূর্বে আপনি কোনদিন তাকে দেখেছিলেন?

না।

আরও কিছুক্ষণ পুলিশ ইন্সপেক্টার মনিরাকে জেরা করার পর বিদায় গ্রহণ করলেন।

মনিরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মস্ত একটা বিপদ থেকে যেন সে উদ্ধার পেল। মনিরা অত্যন্ত সাবধানে পুলিশ ইন্সপেক্টারের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিল, কাজেই তার কথাবার্তা বা আচরণে তাকে কোন রকম সন্দেহ করতে পারেননি পুলিশ ইন্সপেক্টার।

মুরাদের হাত থেকে রক্ষা পেল মনিরা। রক্ষা পেল পুলিশের হাত থেকে। সবচেয়ে বড় শান্তি তার স্বামী বেঁচে আছে। অনাবিল একটা আনন্দস্রোত মনিরার মনকে আপ্লুত করে দিয়েছে। যদিও তার স্বামীর মনে মুরাদের কথাগুলো অবিশ্বাসের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তবু এতটুকু দমে যায়নি সে। একদিন না একদিন এ ভুল তার স্বামীর ভেঙ্গে যাবে, একদিন ফিরে আসবে সে তার প্রাশে। আবার বলিষ্ঠ বাহু দুটি দিয়ে আলিঙ্গন করবে--- ঐ দিনটির প্রতীক্ষায় প্রহর গুণবে মনিরা। অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষা করবে সে।

কয়েক দিন পর পুলিশের অনুমতি নিয়ে মনিরা হোটেল থেকে বিদায় গ্রহণ করল। কিন্তু এখন সে যাবে কোথায়? ঝিন্দ শহর তার কাছে নতুন। যদিও এ শহরে তার বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছে, তবু দিনগুলো মনিরার স্বাভাবিকভাবে কাটেনি। কিছুদিন কেটেছে বনহুরের কেনা বাড়িতে, কিছুদিন মুরাদের বন্দীশালায় কিছুদিন কেটেছে বিভিন্ন স্থানে। মনিরা শহরের কোন জায়গা বা লোকজন কাউকেই চেনে না বা পরিচয় নেই।

এক রাতে নূরকে বুকে নিয়ে গাড়িতে চেপে বসল মনিরা। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল—কাঁহা জায়েঙ্গী মাইজী?

মনিরা চট করে কিছু বলতে পারলো না, একটু চিন্তা করে নিল। যা হোক এখন তার স্বামীর দেয়া সেই বাড়িখানাতেই ফিরে যাওয়া উচিত। সেখানে তাদের অনেক অনুচর আছে, দাসদাসী আছে, নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা হবে না তার। মনিরা তাদের বাড়ির ঠিকানা বলল।

কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে অবাক হল মনিরা— অপরিচিত এক পরিবার বাড়িটাতে বাস করছে।

মনিরা এবার কোথায় যাবে, কি করবে ভেবে পায় না। বাড়ির মালিক জানিয়ে দিলেন বাড়িখানা তাঁরা কিনে নিয়েছেন, যারা তাঁর নিকট বাড়ি বিক্রি করেছে তারা চলে গেছে এদেশ ছেড়ে।

মনিরার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। চোখে অন্ধকার দেখছে, এখন সে কোথায় যাবে। ঝিন্দ শহরে তার আপন জন কেউ নেই, কাউকেই সে চেনে না, জানে না।

মনিরা নূরকে বুকে চেপে ধরে পথের বুকে নেমে দাঁড়ালো। দিশেহারা পথিকের মত পথ বেয়ে এগিয়ে চলল সম্মুখ দিকে।

মনিরার অপূর্ব রূপরাশি পথিকদের মনে প্রশ্ন জাগাল। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কে এই মেয়েটি কোথায়ই বা চলেছে। কেউ বা শিস দিল, কেউ বা বিদ্রূপ করল। মনিরা কোনদিকে না তাকিয়ে আপন মনে এগিয়ে চলেছে।

এমনি করে কতক্ষণ পথে পথে ঘুরে বেড়াবে সে? সন্ধ্যা আসন্ন প্রায়, তার পূর্বেই একটা কোন নিরাপদ স্থানে তাকে আশ্রয় নিতে হবে। তাছাড়া কচি নূর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বিশ্রামের প্রয়োজন এখন তার।

মনিরা সামনে একটা বাড়ি দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল। মস্ত বড় গেট গেটের ওপাশেই গাড়ি- বারান্দা।

মনিরা গেটের নিকটে পৌঁছতেই একটা লোক বলল— কি চাও?

মনিরা বলল— রাতের মত থাকার একটু জায়গা চাই। লোকটা একটু ভেবে বলল—আচ্ছা, দাঁড়াও ভেতরে জিজ্ঞাস করে আসি।

একটু পরে ফিরে এলো লোকটা বলল— এসো।

মনিরার পা দু'খানা হঠাৎ কেঁপে উঠল, অজানা একটা আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা টিপটিপ করে উঠল। না জানি এ কার বাড়ি। বাড়ির মালিক কেমন মানুষ কে জানে। কিন্তু এত ভেবে কি হবে, রাতে পথের বুকে রাত

কাটানো তার সম্ভব নয়! আশ্রয় তার চাই, কাজেই ভয় পেলে তো চলবে না। মনিরা লোকটাকে অনুসরণ করল।

কয়েকখানা কক্ষ পেরিয়ে একটা কক্ষে এসে প্রবেশ করল লোকটা কাল কাপড়ের পর্দা উচু করে ধরে বলল— যাও!

মনিরা নূরকে কোলে করে কক্ষে প্রবেশ করল। কক্ষে প্রবেশ করেই ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠল। একটা চৌকির ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে এক প্রৌঢ় মেয়েলোক। বিরাট বপু। মাথায় একরাশ চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। মোটা পুরু দুখানা ঠোট। ঠোটের ফাঁকে তামাকের নল গোজা রয়েছে। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটা, দপ দপ করে জ্বলছে। মেয়েমানুষ নয়, যেন পুরুষের বাবা।

মনিরা ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল মহিলাটির দিকে।

মনিরাকে দেখতে পেয়ে মেয়েলোকটা তার বিপুল বপুখানা নাড়াচাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল। বাঁ হাতে নলটা একপাশে সরিয়ে বলল— তুমিই রাতের জন্য আশ্রয় চাও?

মনিরা ঢোক গিলে বলল— হ্যাঁ।

গম্ভীর ভারী গলায় বলল মহিলাটি— তোমার কোলে কি ওটা?

নূর তখন মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মনিরা বলল— আমার ছেলে!

হিংস্র একটা হাসির আভাস ফুটে উঠল— ভীমকার মহিলার ঠোটের ফাঁকে।

মনিরা শিউরে উঠল। একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল তার বুকটা। নিজের জন্য মনিরা এতটা ভীত নয়, কেমন যেন ভয় হল তার নূরের জন্য। মনিরা বুকে আঁকড়ে ধরল কচি নূরকে।

মহিলা মেঘের মত গর্জন করে উঠল— বেশ, ওকে নিয়ে যা, পাশের ঘরে ওর থাকার জায়গা করে দে।

মনিরার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। এখানে কেন এসেছিল সে! এমন আশ্রয়ের চেয়ে ফুটপাতের আশ্রয় তার অনেক ভাল ছিল। এমন ভয় হচ্ছে কেন তা বুঝতে পারে না মনিরা। পালাবার জন্য মন তার অস্থির হয়ে উঠল।

লোকটা এবার মনিরাকে সঙ্গে করে একটা ছোট ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের দরজায় তালা লাগান।

মনিরার সামনে যেন আর একটা নতুন বিপদের ঘন ছায়া নেমে আসছে। কে যেন অদৃশ্য হাতে গলাটা টিপে ধরছে তার।

লোকটা ততক্ষণে দরজা খুলে ধরেছে— যাও, এ ঘরে রাত কাটাও।

মনিরা নিরুপায়ের মত নূরকে কোলে করে কক্ষের দরজার পা রাখল। কক্ষে প্রবেশ করে দেখল খুব বড় নয় কক্ষটা। কক্ষের মেঝেতে গালিচা পাতা। একপাশে কয়েকটা বালিশ বিক্ষিপ্ত ছড়ান রয়েছে। মনিরার দৃষ্টি হঠাৎ চলে গেল এক পাশে—একি! চমকে উঠল সে। গালিচার এক ধারে একটা রেকাবির উপর কয়েকটা কাঁচের গ্লাস আর খালি কয়েকটা বোতল পড়ে রয়েছে। মনিরা মুহূর্তে বুঝে নিল ওগুলো কিসের বোতল।

শিউরে উঠল মনিরা, সর্বনাশ, আবার সে কোন্ কু-ব্যক্তির কবলে পড়ল। তার জীবনটাই কি শুধু এমনি বিপদ আর বিপদে ভরা!

কি করবে মনিরা, এ কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করবে—না এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে? নিশ্চয়ই তার জন্য এ কক্ষ নিরাপদ স্থান নয়, বুঝতে পারল সে।

হঠাৎ নূর কেঁদে উঠল।

মনিরা নূরকে বুকে আঁকড়ে ধরে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু একি! দরজা কখন বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে লোকটা চলে গেছে। মনিরা ধাক্কা দিতে লাগলো আর বারবার ডাকতে লাগল—এ দরজা খোল, দরজা খোল, আমার ছেলে কাঁদছে। এই, দরজা খোল।

কিন্তু কোন সাড়াশব্দই এল না বা দরজা খোলার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। মনিরা খাঁচায় বন্দী হরিণীর মত ছটফট করতে লাগল। নূর কিছুতেই কান্না বন্ধ করছে না।

অগত্যা মনিরা নূরকে নিয়ে মেঝেতে গালিচার ওপর বসে পড়ল। গোটা দিনটা কেটে গেল নূর কিছু খায়নি, এক্ষণে মায়ের দুধ সে প্রাণভরে পান করতে লাগল।

হাজার চেষ্টা করেও সে বদ্ধ কোঠা থেকে নিজকে বাইরে আনতে সক্ষম হল না মনিরা। নিজের এ ভুলের জন্য অনুতাপ করতে লাগল।

সারা দিনের ক্লান্তি আর অবসাদে মনিরার দেহ অবসন্ন হয়ে এসেছিল! কখন যে নূরকে বুকে নিয়ে গালিচার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে স্মরণ নেই। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সে। কক্ষে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল। সে

চোখ মেলে তাকাল কেউ যেন দেখতে বা জানাতে না পারে সেভাবে তাকিয়ে দেখল।

চোখ মেলে চাইতেই আড়ষ্ট হয়ে গেল মনিরার সমস্ত দেহ। সেই বিরাট বপু মেয়েলোকটি— তার সঙ্গে একটি তেমনি বিরাট শরীর বিশিষ্ট লোক। দু'জনের মধ্যে নীচুস্বরে কথাবার্তা হচ্ছিল। আলোচনা যে তাকে নিয়েই হচ্ছে বুঝতে বাকী রইল না মনিরার। কেঁপে ওঠে তার অন্তরটা—হায়, একি বিপদ দিলে খোদা! মনিরা নূরকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

মেয়েলোকটি বলল— দেখলে তো, যেমন কম বয়স, তেমনি রূপের ডালি— কত দেবে বল?

এবার পুরুষটার কণ্ঠ— আট হাজারের বেশি পারব না। কারণ ওকে বাগে আনতে আমার আরও অনেক কাঠ কয়লা পোড়াতে হবে।

মেয়েলোকটি গলার আওয়াজ—কাঠ কয়লা পোড়াতে হবে বলেই তো দশ হাজার, নইলে বিশ হাজারের কমে যেত না। বল পারবে— না অন্য খরিদ্দারকে দেখাব?

লোকটা বুঝি মাথা চুলকাচ্ছে, খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। তার সঙ্গে একটা ঘোৎ ঘোৎ শব্দ, এবার লোকটা বলল— কিছু কম কর বাঈজী দিদি।

কম --চাপাকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল মেয়েলোকটি, তারপর বলল— বেরিয়ে যাও, হবে না।

আরে শুনো বাঈজী দিদি, শুনো। চটো কেন?

আস্তে কথা বল, জেগে উঠবে ছুড়ী।

যাক, তাহলে ঐ দশ হাজার ছাড়া দেবে না?

না, না, না, বরং দু'দিন রেখে আরও বেশি টাকা পাবো। বাচ্চটাকে আগে সরিয়ে ফেলতে দাও---

মেয়েলোকটির কথায় মনিরার হৃদয় কেঁপে উঠল, বলে কি—বাচ্চাটাকে সরিয়ে ফেললে তার দাম আরও বাড়বে! মনিরা কি করবে ভেবে অস্থির হল।

লোকটা বুঝি ভাবছে, দশ হাজারে নিলে ঠকবে নাতো। এবার বুঝি মনস্থির করে ফেলেছে লোকটা, বলল— যাক, দশ হাজার টাকাই পাবে, কিন্তু ছেলেটা তোমাকে রাখতে হবে বাঈজী দিদি।

এর জন্য আবার চিন্তা, এ তো ভাল কথা, বাচ্চাটাকে আর একজনের কাছে দু'পাঁচ হাজারে চালিয়ে নেব—

লোকটা এবার বলল— তাহলে আমি রাজী।

মনিরা এবার আচমকা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল এবং তীব্র কণ্ঠে বলল— না, কিছুতেই তোমরা আমাকে বিক্রি করতে পারবে না। আমি সব কথা পুলিশকে জানিয়ে দেব।

মেয়েলোকটি কটমট করে তাকালো দাঁতে দাঁত পিষে বলল—পুলিশকে জানাবে! পুলিশ কোথায় বাছাধন! পুলিশ কোথায়?

মনিরা নূরকে কোলে আঁকড়ে ধরে বলে উঠল— আমি এসেছি তোমাদের এখানে রাতের মত একটু আশ্রয় পাব বলে। আর তোমরা আমাকে বিক্রি করে টাকা নেবে—এত বড় শয়তান তোমরা?

মেয়েলোকটি রাক্ষসীর মতো হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল— বাঘের গুহায় পা দিয়েছ মেয়ে, আর ফিরে যাবার উপায় নেই। মেয়েলোকটি এবার হাতে তালি দিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটি বিকৃত আকার মেয়েলোক কক্ষে প্রবেশ করে এক পাশে দাঁড়াল।

বিশাল বপু মেয়েলোকটি এবার তাকে ইংগিত করল মনিরার কোল থেকে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিতে।

দু'হাত প্রসারিত করে বিকৃত আকার নারীটি মনিরার কোল থেকে ঘুমন্ত নূরকে কেড়ে নিতে গেল।

মনিরা অমনি নূরকে বুকে চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলো—কিছুতেই তোমরা আমার কাছ থেকে আমার ছেলেকে কেড়ে নিতে পারবে না। যাও, যাও তোমরা---

বিকৃত আকার মেয়েলোকটি তখনও কঙ্কালের মত হাত দু'খানা প্রসারিত করে এগুচ্ছে।

মনিরা পিছিয়ে যাচ্ছে, বুকের মধ্যে তার ঘুমন্ত নূর। সেকি অদ্ভুত দৃশ্য!

মনিরা অসহায়ের মত বাচ্চাটিকে বুকে করে পিছিয়ে যাচ্ছে। আর জীবন্ত কঙ্কালের মত বিকৃত আকার মেয়েলোকটি দু'হাত মেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

মনিরা জানে না পেছন দিকে দাঁড়িয়ে বিরাট বপু মহিলাটি। খপ্ করে মনিরাকে ধরে ফেলল সে, বাঘের থাবায় যেন মেষ শাবক। মনিরার ঘাড়

ধরে দাঁড় করিয়ে দিল, তারপর অতি সহজে মনিরার কোল থেকে নূরকে কেড়ে নিল।

আর্তনাদ করে উঠল নূর।

মনিরার হৃদয় খান খান হয়ে যেতে লাগল, সে নূরের দিকে হাত বাড়ালো।

অমনি ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটা মনিরাকে ধরে ফেলল। লোহার সাঁড়াসির মত ওর হাতখানা মনিরার কোমল হাতের ওপর দাগ কেটে বসে পড়ল, মনিরা শত চেষ্টা করেও নিজের হাতখানা বলিষ্ঠ লোকটার হাতের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলো না।

লোকটা দক্ষিণ হাতে মনিরার হাত মুঠায় চেপে ধরে বাঁ হাতে পকেট থেকে একতোড়া নোট বের করে বিরাট বপু বাঈজী দিদির হাতে গুঁজে দিল।

এবার লোকটা হাঁক দিল— ভজুয়া, ভজুয়া --

অমনি কক্ষে প্রবেশ করল একটা জোয়ান বলিষ্ঠ লোক। হাতে তার একটা কাল কাপড় আর একগাছা দড়ি।

লোকটা মনিরাকে বাঁধতে আদেশ করল।

ভজুয়া মনিরাকে বেঁধে ফেলল। সেই লোকটা এবং বাঈজী দিদিও তাকে সাহায্য করল, নইলে মনিরাকে কাবু করা একজন বা দু'জনের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল।

মনিরাকে যখন মজবুত করে বেঁধে ফেলছিল, ঠিক তখন বিকৃত আকার মহিলা নূরকে নিয়ে কক্ষ থেকে চলে গেল।

অসহায় মনিরা হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে ঐ কঠিন বাঁধন থেকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হল না।

ঝিন্দ শহরে নেমে এসেছে অন্ধকার ঘনঘটা। রাত গভীর। মনিরাকে নিয়ে একটা এক্কা ঘোড়ার গাড়ি দ্রুত এগুচ্ছে শহরের শেষ প্রান্তের দিকে।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে দড়ির বাঁধনে টন টন করে উঠছে মনিরার হাতের গিরা আর পায়ের গিট! অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মুখে একটা কাপড় গোজা থাকায় নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে মনিরার। তবু নীরবে পড়ে রয়েছে, উপায় নেই নড়ার বা চিৎকার করে কাঁদার। কিন্তু এত দুঃখ-কষ্ট ছাপিয়ে বার বার মনে পড়ছে নূরের কথা। স্বামীর চিহ্নটুকুও বুঝি এবার সে

হারিয়ে ফেলল। নূরের কান্নার সুর এখনও বাজছে তার কানের কাছে। না জানি ওকে ওরা কি করবে—হত্যা করে ফেলবে না তো? তাই বা কে জানে?

পাথুরে রাস্তার উপর দিয়ে গাড়িটা বোধ হয়ে যাচ্ছিলা কারণ ভয়ানক ঝাঁকুনি অনুভব করছিল মনিরা নিজের দেহে। আর কতক্ষণ এমনি করে কাটাতে পারবে, সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। এবার হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়বে মনিরা, ক্রমেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার।

❑

আজ প্রায় বছর হয়ে এলো কায়েস এই অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী। প্রথম প্রথম একটু কিছু খাবার সে পাচ্ছিল। হয়তো কোনদিন শুকনো রুটি কিংবা ভাত। এখন কিছুদিন হলো তাও আর পায় না কায়েস। কেউ আর আসে না বা খাবার দিয়ে যায় না তার কারাকক্ষে। একটা মাটির হাঁড়িতে কিছু পানি ছিল সেই পানি খেয়ে কোনরকমে জীবনে বেঁচে রয়েছে। সে পানির মধ্যেও ছোট ছোট এক রকম কীট জন্মে গেছে। পানির রংটাও পাল্টে সবুজ আকার ধারণ করেছে। তবু চোখ বন্ধ করে তৃপ্তির সঙ্গে সেই পচা দুর্গন্ধযুক্ত পানি পান করে কায়েস।

চেহারা কঙ্কালসার হয়ে গেছে। চোখ দুটো গর্তের মধ্যে বসে গেছে। চোয়াল দুটি উঁচু হয়ে উঠেছে কেমন বিশ্রীভাবে দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে। মুখে একমুখ দাড়ি, মাথায় জটাধরা একমাথা চুল। আংগুলের নখগুলো মস্ত বড় বড় হয়ে গেছে। হঠাৎ কেউ কায়েসকে দেখলে মানুষ বলে চিনতেই পারবে না। একটা অদ্ভুত জীবের মত দেখতে হয়েছে সে।

মানুষের প্রাণ এত শক্ত, এত কঠিন, এত কষ্টেও সে এখনো বেঁচে আছে—মরে যায়নি।

কিন্তু আর কতদিন সে এই নরক-যন্ত্রণা এমনি করে তিলে তিলে ভোগ করবে। কায়েস জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছে। বাঁচার সখ আর তার নেই। এ অবস্থাতেও কিন্তু কায়েসের মনে সদাসর্বদা মনিব-পত্নী মনিরার কথা

উদয় হচ্ছিল। না জানি সে এখন কোথায়, কেমন আছে। তার গর্ভে সর্দারের সন্তান —না জানি সে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তার অবস্থা কেমন আছে। পুত্রসন্তান জন্মেছে না কন্যাসন্তান জন্মেছে কে জানে। বেঁচে আছে না মরে গেছে তাই বা কে জানে! কায়েসের মনে একটা ক্ষীণ আশার আলো মিটমিট প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে। তার সর্দারের পত্নী মনিরার গর্ভে কন্যা না জন্মে যদি ছেলে জন্মগ্রহণ করে থাকে তাহলে একদিন আবার তার সর্দারের আসন পূর্ণ হবে --অন্ধকার কারাকক্ষে কায়েসের নিষ্প্রভ চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল।

কায়েস যে কক্ষে বন্দী ছিল, সে কক্ষে মাত্র একটা দরজা ও হাওয়া প্রবেশের একটি ছোট গর্ত ছিল। গর্তটাও প্রায় ছাদের কাছাকাছি। সে গর্ত দিয়ে সামান্য আলো আসতো কারাকক্ষে। কখনও কখনও সে গর্তে সূর্যের ক্ষীণ আলোর ছ'টা দেখতে পেত কায়েস। বেশ কিছুদিন এ আলোর রশ্মি দেখতো আবার হয়তো ধীরে ধীরে আঁলোর ছ'টা মিশে যেত আর দেখা যেত না। কায়েস বুঝতে পারতো মাস পাল্টে যাচ্ছে তাই প্রকৃতির এই পরিবর্তন।

কিন্তু আর কত দিন এই অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করবে। কেউ তো আর আসে না, কেউ তো আর তার সন্ধান নেয় না। তবে কি শয়তানের দল সব মরে গেছে না চলে গেছে এ দেশ ছেড়ে। তাকে হত্যা না করে জীবিত রেখেই চলে গেছে। তবু কায়েস কারও আগমন প্রতীক্ষায় দিন গোনে।

হঠাৎ একদিন তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এত দিন তার মাথার উপর গর্তটা যদি আংগুল দিয়েও খুঁড়ে বড় করবার চেষ্টা করত তবু হয়তো সফলতা লাভ করতে পারত। যে কক্ষে কায়েসকে বন্দী করে রাখা হয়েছে সেটা যে মাটির নিচে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কায়েস একটু কষ্ট করলে ছাদটা নাগাল পেতে পারে। যদিও সিমেন্ট করা কিন্তু বহু দিনের পুরনো। চুন, বালু, ইট সব লোনা ধরে খসে খসে পড়ছে। কাজেই রোজ কিছু কিছু ভাঙার চেষ্টা করলেও এতদিন সে ঐ গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যাবার মত ফাঁক করে ফেলতে পারত।

কায়েসের মনে একটা বেঁচে থাকার বাসনা উকি দিয়ে গেল। এবার সে তার ছাদের গর্তটা ফাঁক করার জন্য চেষ্টা নিল।

দিনরাত অবিরাম কাজ করে চলল কায়েস।

কখন রাত, কখন দিন যদিও বুঝার কোন উপায় ছিল না, তবু ঐ গর্তের সামান্য আলোতে সে বুঝতে পারত এখন রাত বা দিন হয়েছে।

সব সময় আংগুলের নখ দিয়ে লোনাধরা সিমেন্ট আর বালির চাপ খুলে ফেলত। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ত তখনই ঐ পচা দুর্গন্ধময় পানি পান করত। আবার কাজ শুরু করত। আবার যখন ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসত তার শরীরটা তখন মাথার নিচে হাত রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ত। ঘুম ভাঙলে আবার চলত তার কাজ।

❑

মনিরার যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন সে চোখ মেলে দেখতে পেল একটা খাটের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে তাকে। সমস্ত শরীর ব্যথায় টনটন করছে। মনিরা স্মরণ করতে চেষ্টা করল এখন সে কোথায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সব কথা মনে পড়ল তার। নূরের কথা মনে হতেই উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল সে। না জানি এখন সে কোথায়! এতটুকু কচি শিশু—দুধ ছাড়া কিছু সে খায় না। আহা, কেঁদে কেঁদে গলা বুঝি শুকিয়ে গেছে। মনিরা আকুলভাবে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করল একটা লোক। হাতে তার একটা গ্লাস, মনিরার সামনে এসে দাঁড়াল—এই নাও, এতে দুধ আছে, খেয়ে নাও।

মনিরা মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সারাদিন কিছু খেল না সে, সর্বক্ষণ কাঁদতে লাগল। বিকেলে হঠাৎ সেই লোকটা এসে হাজির হল তার কক্ষে। যে লোকটা বিরাট বপু মহিলার কাছ থেকে তাকে কিনে নিয়েছিল দশ হাজার টাকা দিয়ে— এ সেই লোক।

মনিরা ওর দিকে তাকিয়ে ভয়ে শিউরে উঠল।

লোকটা দাঁত বের করে একটু হাসলো, কি ভংঙ্কর কুৎসিত সে হাসি! এবার মনিরার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল— কেমন আছ প্রিয়া!

মনিরার মাথা থেকে পা পর্যন্ত রি রি করে উঠল। লোকটার কথা তার শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল।

লোকটা এবার তার বিছানার একপাশে বসে পড়ল। শিউরে উঠল মনিরা। খাটের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসল সে। হাত বাড়াল লোকটা মনিরার দিকে— যাবে কোথায়, তুমি যে এখন আমার!

যেমনি লোকটা মনিরাকে ধরতে গেল— অমনি মনিরা খাট থেকে নেমে সরে দাঁড়াল। বুকটা ধক ধক করতে লাগল তার।

লোকটার দু'চোখে লালসাপূর্ণ চাহনি। দু'হাত মেলে এগুতে লাগলো মনিরার দিকে।

মনিরা নিজেকে বাঁচাবার জন্য ব্যাকুল নয়নে চারদিকে তাকাল। হঠাৎ সে হাতের পাশে অনুভব করল শক্ত একটা জিনিস।

মনিরা হাতের মুঠায় তুলে নিল জিনিসটা—একটা পাথরের ক্ষুদে বাঘ সেটা।

লোকটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

মনিরা পিছু হটতে হটতে দেয়ালে গিয়ে ঠেকে পড়ল, আর কোন্ দিকে সরবে। লোকটা এবার ধরে ফেলবে—মনিরা উপায় না দেখে হাতের পাথরের মূর্তিটা ছুড়ে মারল লোকটার মাথা লক্ষ্য করে।

মনিরার লক্ষ্য ব্যর্থ হল না, লোকটার মাথায় লেগে ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। তারপর দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল কিন্তু বেশিদূর এগুতে না এগুতেই দু'জন লোক মনিরাকে ধরে ফেলল, বলল—পালাচ্ছ কোথায়? দশ হাজার টাকা তোমার দাম।

টেনে হিঁচড়ে মনিরাকে আবার সেই ঘরে নিয়ে এল লোক দু'টি।

মনিরা তাকিয়ে দেখল তার হাতে আহত ব্যক্তি এখনও মেঝেতে বসে কাতরাচ্ছে। রক্তেরাঙা হয়ে উঠেছে তার জামা-কাপড়। কয়েকজন গুন্ডা প্রকৃতির লোক ওর মাথার ঔষধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে।

মনিরা বুঝতে পারল, এটা কোন গুণ্ডাদলের আস্তানা। এখানকার প্রত্যেকটা লোকের চেহারা শয়তানের মত দেখতে। যে লোকটা তাকে কিনে এনেছে এবং তার হাতে আহত হয়েছে, সেই যে এ দলের নেতা বা সর্দার তা বুঝতে বাকী রইল না মনিরার।

লোক দু'জন মনিরাকে পুনরায় সেই কক্ষে এনে পিছমোড়া করে খাটের সঙ্গে বেঁধে ফেলল।

ততক্ষণে দলপতির মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে। এবার রক্তচক্ষু নিয়ে তাকাল সে মনিরার দিকে, তারপর গর্জন করে বলল— চাবুক লাগাও! শরীরের চামড়া ছিড়ে ফেল।

হুজুর, চাবুক লাগালে মরে যাবে যে! বলল একটা লোক।

দলপতি হুঙ্কার ছাড়ল— মরুক—

অন্য একজন বলল—হুজুর— দশ হাজার টাকা—

যেতে দাও!

তার চেয়ে ওকে ফেরত দিয়ে দেয়াই ভাল।

হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছ! তাই করব, এমন রাক্ষসী মেয়ে আমি চাইনা। যাও, ওকে আজই চালান করে দাও।

আচ্ছা হুজুর, তাই করব।

করব নয়-কর।

উপস্থিত চাবুকের আঘাত থেকে বেঁচে গেল মনিরা, তার ওপর তাকে আবার সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে তার নূর আছে। মনে মনে খুব খুশি হল সে। বুকের মধ্যে নূরের জন্য তোলপাড় শুরু হয়েছে। কিন্তু কখন নিয়ে যাবে? আর কতক্ষণ পরে? মনিরা ছটফট করতে লাগল।

কিন্তু মনিরা যত সহজে পরিত্রাণ পাবে ভেবেছিল তত সহজে পেল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে ঐ খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হল। কিছু খেতেও দেয়া হল না।

সন্ধ্যার পর যখন গোটা পৃথিবী ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল তখন মনিরাকে হাত-পা-মুখ বেঁধে একটা ঘোড়ার গাড়িতে তুলে নিল ওরা।

গাড়ি চলতে শুরু করল মনিরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না, শুধু অনুভব করছে সে গাড়িটা কোন উচুনীচু পথ ধরে এগুচ্ছে। প্রচণ্ডভাবে গাড়িখানা নড়ছে আর দুলছে।

বেশ কিছু সময় ধরে গাড়িখানা এমনিভাবে চলার পর এবার মনে হল বেশ সমান পথ ধরে চলতে শুরু করল গাড়িটা। আর কোন রকম ঝাঁকুনি লাগছে না।

মনিরা গাড়ির মধ্যে থেকেই বুঝতে পারছে, যে পথ বেয়ে এখন তাদের গাড়ি চলেছে সেটা জনমুখর রাজপথ। নানা রকম যানবাহনের শব্দ

তার কানে আসছে। সময়টা রাত। গাড়ির ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তার লাইটপোষ্টের আলোও দেখা যাচ্ছে।

বেশ কিছু সময় চলার পর গাড়িখানা থেমে পড়ল। আশায় আনন্দে মনিরার মনের মধ্যে আলোড়ন হচ্ছে। যত দুঃখ-কষ্টই হোক নূরকে সে বুকে ফিরে পাবে, এটাই তার বড় পাওয়া।

গাড়ির দরজা খুলে তাকে বের করে আনা হল। যদিও মনিরার হাতমুখ বাঁধা ছিল তবু দেখতে পেল এটা সেই বাড়ি যে বাড়িতে একদিন মনিরা রাতের মত আশ্রয়ের আশায় প্রবেশ করেছিল। সেই ভীমকায় মহিলার চেহারা মনে পড়তেই মনিরার বুক কেঁপে উঠল, না জানি আবার তার অদৃষ্টে কি আছে!

মনিরাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হল।

সেই কক্ষে, যে কক্ষে মনিরা প্রথম প্রবেশ করে ঐ বিরাট বপুধারিণী নারীটিকে দেখতে পেয়েছিল। মনিরাকে নিয়ে দুটি লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করল।

একজন বলল— একে তিনি ফেরত পাঠালেন।

কর্কশ কণ্ঠে গর্জে উঠল বিরাট বপুধারিণী— ফেরত পাঠাল, কেন, কি হয়েছে?

মহিলার গর্জনে লোক দুটোর বুক থর থরিয়ে কেঁপে উঠল, অন্যজন হাতে হাত কচলে বলল—এমন রাক্ষসী মেয়ে নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের মনিবকে এ আহত করেছে।

দাঁতে দাঁত পিষল বিরাট বপু ধারিণী—কি বললে!

মনিবকে জখম করে দিয়েছে—এই শয়তানী!

তাই নাকি? একটু থেমে বলল মহিলা— একটা মেয়েকে বাগে আনতে পারলো না, এমন পুরুষের বাচ্চা তোদের মনিব। আরে ছোঃ, থুক দেই অমন পুরুষের মুখে। তারপর বিছানার তলা থেকে একতাড়া নোট বের করে ছুড়ে দিল সে লোক দুটোর গায়ে—নিয়ে, যা তোদের মনিবকে দিয়ে দিস। হতভাগাগুলো!

লোক দুটো টাকার তাড়াগুলো দ্রুত হস্তে কুড়িয়ে নিল তারা পালাতে পারলে যেন বেঁচে যায়।

লোক দুটি বেরিয়ে যেতেই হুংকার ছাড়ল মহিলাটি— শয়তানী, বড্ড বেপরোয়া হয়েছ! জান কার হাতে পড়েছ তুমি?

মনিরা তাকিয়ে দেখল বিরাট দেহধারিণীর দু'চোখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। দাঁত কটমটিয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে।

মনিরার মন তখন নূরের জন্য ছটফট করছে। মায়ের প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। আকুলভাবে কেঁদে বলল মনিরা— আমার ছেলে কোথায়? আমার ছেলে?

ছেলে! গর্জন করে উঠল মহিলা— ছেলে নেবে?

হ্যাঁ, আমার ছেলে দাও?

হেসে উঠল ভীমকায় মেয়েলোকটি— ছেলেকে আর পাচ্ছো না।

কেন! কোথায় নূর?

সে এখন চলে গেছে— অনেক দূরে, বুঝেছ?

কোথায় তাকে পাঠিয়েছ তোমরা? কি করেছ তাকে?

বিক্রি হয়ে গেছে— তোমার চেয়ে তার মূল্য আমি অনেক বেশি পেয়েছি! তার দক্ষিণ বাজুতে যে কাল জট রয়েছে, সেই জটই তার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে, বুঝেছ?

মনিরার মনে পড়ল— নূরের দক্ষিণ হাতের বাজুর ওপর কাল একটা জট ছিল, নূরের জন্মের পর মনিরা অবাক হয়েছিল প্রথমে, এমন হয়েছে কেন! নেড়েচেড়ে দেখল সে নূরের সাদা ধবধবে ছোট বাজুর ওপর কাল একটা দাগ ঠিক একটা পয়সার মত। তবে কি সেটা, কোন লক্ষণযুক্ত সন্তান তার? হয়তো কিছু হবে, নইলে আজ এ কথা শুনবে কেন? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল মনিরা— কোথায়, কার নিকট তোমরা বিক্রি করেছ? তোমাকে আমি অনেক অনেক টাকা দেব, আমার সন্তানকে তোমরা ফিরিয়ে এনে দাও।

টাকা, ভিখারিণী দেবে টাকা! কোথায় পাবি টাকা? কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল মহিলাটি।

মনিরা তেমনি ব্যাকুল কণ্ঠে বলল— ওর বাবা লাখ লাখ টাকার মালিক। যত টাকা চাও, তাই পাবে তোমরা। আমার নয়নের মনিকে তোমরা ফিরিয়ে এনে দাও।

আবার মহিলাটি বিকট শব্দে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল । তারপর ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে বলল, ওর বাবা লাখ লাখ টাকার মালিক, আর তুমি ওর মা হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে এতটুকু আশ্রয়ের জন্য---------হাঃ হাঃ হাঃ! হাসিতে ফেটে পড়ল বিশাল বপুধারিণী। হাসি থামিয়ে বলল আবার—

এতক্ষণে হয়তো তোমার সন্তানের রক্তে কাপালিক সন্ন্যাসী তার কালীপূজা শেষ করছে---

শয়তান মেয়ে লোকটার কথা শেষ হয় না, মনিরা তার বাঁধা হাত দুটি দিয়ে চেপে ধরল মেয়েলোকটার গলা— কি বললি! কি বললি পিশাচিনী--

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলোকটা হাতে তালি দিল, অমনি দু'জন বলিষ্ঠ লোক মনিরাকে সরিয়ে নিল।

মেয়েলোকটা তার বিরাট দেহটা নিয়ে ক্রুদ্ধ সিংহীয় ন্যায় গর্জন করে উঠলো— নিয়ে যাও! ঐ ঘরে আবার বন্ধ করে রাখ। রাক্ষসী দেখছি পুত্রশোকে ক্ষেপে উঠেছে। আমাকেও হত্যা করতে যাচ্ছিল---দাঁতে দাঁত পিষে বলল আবার—হেমাঙ্গিনীর হাতে পড়েছ। যার হাতে সাতটা জোয়ান পুরুষ ভেড়া বনে যায় তুমি তো একটা পুচকে ছুড়ী! নিয়ে যা, হা করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?

বলিষ্ঠ জোয়ান লোক দুটি মনিরাকে একরকম শূন্যে ঝুলিয়েই নিয়ে চলল।

❑

আবার সেই কক্ষ।

মেঝেতে গালিচা পাতা। কতগুলো তাকিয়া ছড়ানো রয়েছে গালিচার একপাশে। কয়েকটা মদের বোতল এপাশে ওপাশে কাৎ হয়ে পড়ে আছে, কাঁচের কয়েকটা গ্লাসও বিক্ষিপ্ত ছাড়ান। কক্ষে তখনও ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে।

মনিরাকে কক্ষে ঠেলে দিয়ে লোক দুটো দরজায় তালা আটকিয়ে চলে গেল।

মনিরা দু'হাতে দরজায় ঝাঁকুনি দিয়ে খোলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু একচুলও নড়লো না বা দুললো না শালকাঠের দরজাটা।

মেঝেতে পড়ে মাথা আছড়ে কাঁদতে লাগল সে। হায়, একি হল তার! একি সর্বনাশ হল। সব হারাল মনিরা—স্বামী-পুত্র সব। ছোটবেলায়

পিতা-মাতাকে হারিয়েছিল, বড় হয়ে মামাকে হারাল, মামী বেঁচে থেকেও আজ নেই— নেই তার কোন আত্মীয়স্বজন। স্বামী তার স্বাভাবিক মানুষ নয়, তবু ছিল তার পাশে-সেও আজ নেই। একমাত্র নূর ছিল তার সম্বল তাকেও হারিয়েছে। শুধু হারিয়েই যায়নি সে, চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেছে। কোন সন্ন্যাসীর হাতে অবোধ শিশু নূর জীবন বিসর্জন দিয়েছে--

আর ভাবতে পারে না, মনিরা -----বুকটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

দিনরাত মাথা ঠুকে কাঁদলেও আর সে ফিরে আসবে না। আর তার বুকে মুখ লুকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসবে না। আধো আধো কণ্ঠে মা-মা বলে ডাকবে না। মনিরা নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে লাগল, বুকে আঘাত করে চিৎকার করে ডাকল নূর-নূর, কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না।

ক্ষুধা-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল মনিরা, সব ভুলে গেছে। নূরের মৃত্যু-সংবাদে সব ভুলে গেছে সে।

কখন যে তার সামনে কে খাবার রেখে গেছে দেখতেই পায়নি মনিরা। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মনিরার দৃষ্টি পানির পাত্রে পড়তেই দু'হাত বাড়িয়ে গেলাসটা তুলে নিল এক নিঃশ্বাসে পানি পান করে শূন্য গ্লাসটা রেখে দিল মেঝেতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল দু'টি লোক, সঙ্গে আর একটি যুবতী এবং সেই বিশাল দেহধারিণী হেমাঙ্গিনী। মনিরা লোক দুটির একজনকে দেখে চিনতে পারল; যে তাকে প্রথম দিন এ বাড়িতে আশ্রয় দেবার আশা দিয়ে নিয়ে এসে ছিল সে অন্যজন— নতুন লোক।

মনিরা যুবতীটির দিকে তাকাল, বেশ বুঝতে পারল তাকেও জোরপূর্বক ধরে আনা হয়েছে। মেয়েটার বয়স মনিরার চেয়েও কিছু কম হবে। দেখতে মনিরার মত এত সুন্দরী নয়, তবে একেবারে মন্দও নয়। মেয়েটার চোখে মুখে অসহায় ভাব। সে যে কেঁদেছে তার মুখ দেখেই বুঝা গেল। যুবতী মনিরার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

হেমাঙ্গিনী লোক দুটিকে লক্ষ্য করে বলল-একেও এই ঘরে বন্দী করে রাখ। খদ্দের এলে আমার সঙ্গে দাম দর হবে।

যুবতীটিও যে মনিরার মতই একজন সর্বহারা এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, সে তার সমস্ত আত্মীয়-পরিজনের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন।

হেমাঙ্গিনী তার অনুচরদ্বয়কে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় আর একবার তীব্র কটাক্ষে মনিরাকে দেখে নিল। সে কি জ্বালাময় বিষভরা চাউনি! মনিরার হৃৎপিণ্ডের রক্ত যেন জমে এলো।

ওরা চলে যাবার সময় ঘরের দরজায় তালাবদ্ধ করে চলে গেল।

এবার মনিরার আর একজন সঙ্গী জুটলো। যা হোক তবু কথা বলার একজন হল।

যুবতী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এগিয়ে গেল মনিরা। আঁচলে নিজের চোখের পানি মুছে ফেলে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল—বোন কেঁদো না, আমিও তোমার মত একজন।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে তাকাল যুবতী। এই নরপিশাচদের বাসস্থানে এমন একটা মধুর কণ্ঠস্বর। যুবতী কোন কথা বলতে পারল না, শুধু তাকিয়ে রইলো।

মনিরা বলল—বোন, তুমি কি করে এদের ফাঁদে পড়লে জানতে পারি?

যুবতী আকুলভাবে কেঁদে উঠল, বলল—আমাকে ওরা ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছে।

সে কি!

হ্যাঁ, আমার বুড়ো বাপের সঙ্গে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাবা আর আমি ফেরার পথে গাড়ির জন্য পথের ধারে অপেক্ষা করছি এমন সময় একটা বুড়োমত লোক এসে বাবাকে কোথায় যেন ডেকে নিয়ে গেল। একটু পর ফিরে এলো লোকটা, বলল—আমি তোমার বাবার বন্ধু, তোমার বাবা আমাদের বাড়িতে অপেক্ষা করছেন, তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি কোনরকম দ্বিধা না করে ওর সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসলাম, কারণ একটু পূর্বে বাবা ওর সঙ্গেই যখন গেলেন তখন নিশ্চয়ই তিনি ওদের ওখানেই আছেন। কাজেই আমার কোন সন্দেহ হল না।

মনিরা ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করল— তারপর?

তারপর আমাকে এই বাড়িতে নিয়ে এলো, বাবাকে তো দেখছি না। ঐ যে ভংকর মেয়েলোকটা, আমাকে সেই আটকে রাখল। বলতে পার কেন আমাকে ওরা এ ঘরে বন্ধ করে রাখল। আর তুমিই বা কে?

মনিরা ব্যথাকাতর কণ্ঠে বলল— আমিও তোমার মত একটা অসহায় মেয়ে, আটকে রেখেছে আমাকেও তোমার মত—উদ্দেশ্য ওদের খুব খারাপ।

কি করবে ওরা আমদের বন্দী করে রেখে?

কোন দুষ্ট লোকের কাছে বিক্রি করবে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, এরা মেয়ে বিক্রির ব্যবসা করে।

সত্যি?

হ্যাঁ, নইলে তোমাকে এখানে ফুসলিয়ে এনেছে কেন?

তোমাকেও বুঝি ফুসলিয়ে এনেছে এরা?

মনিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল–না, আমি নিজেই ভুল করে ফাঁদে পা দিয়েছি।

মনিরা অল্পক্ষণের মধ্যেই যুবতীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিল। এই নির্জন কক্ষে অসহায় অবস্থায় ওকে পেয়ে ভালই হল মনিরার। মনের ব্যথা তবু একটু কমলো, নূরের কথা খুলে বলল—সেই যুবতীর কাছে।

যুবতী নিজের পরিচয় দিল, নাম তার সুফিয়া। মনিরা নিজের খাবার সুফিয়াকে খেতে দিল।

সারাটা দিন কেটে গেল, রাত হল।

মনিরা আর সুফিয়া নানারকম দুঃখভরা কথা আলোচনা করল। এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিনা– এ নিয়ে কথাবার্তা হল দু'জনের মধ্যে। কিন্তু কোন উপায়ই খুঁজে পেল না ওরা।

রাতে দু'জনে পাশাপাশি গালিচায় শুয়ে পড়ল। নানা রকম ভয় ও দুশ্চিন্তা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে মনিরার মনে। বারবার মনে হচ্ছে নূরের কথা, আর কোনদিন সে নূরকে দেখতে পাবে না, স্মরণ হতেই আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। চোখের পানিতে গালিচা ভিজে চুপসে উঠল।

সুফিয়া মেয়েটা সারাটা দিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। পাশে মনিরা নিদ্রাহীন চোখে চিন্তার জাল বুনে চলেছে। রাত বেড়ে আসছে।

হঠাৎ একটা শব্দে মনিরা চমকে উঠল। না, ও কিছু নয়, দরজাটা ভালভাবে তালা দেয়া আছে কিনা, কেউ বোধ হয় সেটাই পরীক্ষা করে দেখে গেল।

মনিরা আবার শুয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তখন জমাট ব্যথা গুমড়ে কেঁদে মরছে।

❑

লক্ষ্মী ছেলেটির মত শান্ত হয়ে পড়েছে যেন দস্যু বনহুর। ঝিন্দ থেকে ফিরে আসার পর সে একটা দিনের জন্যও দরবারকক্ষে প্রবেশ করেনি বা তার অনুচরগণকে ডেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনি। কেমন যেন উদাস হয়ে গেছে দস্যু বনহুর, দস্যুতা যেন ভুলেই গেছে সে।

সর্দারের উদাসীনতা তার অনুচরগণের মনে একটা নৈরাশ্য ভাব এনে দিয়েছে। বিশেষ করে রহমান আশঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সর্দার যদি এমন হয়ে পড়ে তাহলে দল চলতে পারে না। আর কতদিন রহমান নিজে দল চালাবে।

দস্যু বনহুরের নীরবতায় কতগুলো শয়তান মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে নানা রকম গোপন চোরা কারবার শুরু হয়েছে। নানা রকম গুপ্ত গুণ্ডামি চলছে, যা পুলিশের সুক্ষ্ম দৃষ্টিকেও হার মানিয়েছে। পুলিমহল জানে, আজকাল দেশ শান্ত, নীরব। দস্যু বনহুর নিখোঁজ হওয়ায় দেশে শান্তি বিরাজ করছে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা ছিল ঠিক তার উল্টো। দস্যু বনহুরের ভয়ে দেশবাসীর প্রাণে জাগে আতঙ্ক, সবাই দুর্ভাবনায় রাত কাটায় সত্য, কিন্তু আসলে কি বনহুর অন্যায়ভাবে কারও ওপর উপদ্রব করে বা করেছে? কোনদিন সে কোন অসহায় অনাথের প্রতি আঘাত হানেনি। কোন মহৎ ব্যক্তির ধনরত্ন লুটে নেয়নি। দস্যু বনহুরের প্রচণ্ড থাবা সব সময়ই টুটি টিপে ধরেছে যত অনাচারী অত্যাচারী আর বদমাইশদের, দেশের যত দুষ্টু কুচক্রী দলের ওপরই সে বারবার হামলা করেছে। দলিত মথিত নিষ্পেষিত করে তবেই ক্ষান্ত হয়েছে দস্যু বনহুর। দেশের দুষ্ট লোকদের

দমন করতে গিয়েই সে সকলের কাছে হয়েছে ভয়ঙ্কর, ভয়ের কারণ। পুলিশের কাছেও সে হয়েছে দোষী অপরাধী।

কাজেই দস্যু বনহুর দেশের একজন মহান ব্যক্তি হয়েও সকলের কাছে হয়েছে ভয়াবহ।

সেই ভয়ঙ্কর ভীতিকর লোকটার এহেন নীরবতায় শুধু দেশবাসীই নয়, পুলিশমহলও নিশ্চিন্ত আশ্বস্ত ছিল।

কিন্তু সম্প্রতি শহরে বা শহরের আশেপাশে একটা নতুন চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। নারীহরণ ব্যাপারটা যেন আজকাল আরও বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে এখান সেখান থেকে প্রায়ই মেয়েছেলে চুরি নিয়ে পুলিশ অফিসে ডায়েরী হচ্ছে। পুলিশ এ নিয়ে চূড়ান্ত চেষ্টা করেও এর কোন সমাধান করতে সক্ষম হয়নি।

সেদিন মাহফুজ সাহেবের একমাত্র কন্যা রেবেকা কোন ফাংশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে উধাও হয়েছে, এখন পর্যন্ত পুলিশ তার কোন সন্ধান করতে পারেনি। গোটা শহর তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে কিন্তু কোথাও রেবেকার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ইতোপূর্বে আরও কয়েকটি যুবতী শহরের বুক থেকে নিখোঁজ হয়েছে, তাদেরও কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি আজ পর্যন্ত।

পুলিশমহল যদিও কিছুদিন বেশ আরামেই দিন কাটাচ্ছিলেন কিন্তু এই নারীহরণ ব্যাপার নিয়ে আবার তারা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে শহরের বিশিষ্ট জননায়ক মাহফুজ সাহেবের কন্যাচুরির ব্যাপার নিয়ে পুলিশমহলে আবার আলোড়ন দেখা দিল।

দিনের পর দিন এমনিভাবে মেয়ে-চুরি বেড়েই চলেছে। এসব মেয়ে কোথায় যাচ্ছে, কোথায় তাদের চালান করা হচ্ছে এর কোন হাদিস পাওয়া যাচ্ছে না! শুধু নারীহরণই নয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে চুরিরও যেন একটা হিড়িক পড়ে গেছে। আজ এর ছেলে, কাল ওর ছেলে, ওর মেয়ে— এমনি দু'চার দিন পর পর ছেলে-মেয়ে— চুরি হয়ে যাচ্ছে অথচ পুলিশ আজও তার কোন সুরাহা করতে পারছে না।

ছেলে-মেয়ে ও নারীহরণ লেগেই আছে অথচ এ ব্যাপারটার পুলিশমহল যেন তেমন গুরুত্বই দেয় না। এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবারও কারও সময় নেই যেন। কিন্তু নারীহরণ এবং ছেলে-মেয়ে চুরি যে দেশ ও দশের পক্ষে কত অমঙ্গল এবং ক্ষতিকর তা সত্যি ভাবার বিষয়।

এতদিন ব্যাপারটা গ্রাহ্য না করলেও এবার মাহফুজ সাহেবের কন্যা চুরির যাওয়ায় শহরে তোলপাড় শুরু হল।

অনেকেরই ধারণা, এই নারীহরণ ব্যাপারটা অন্য কারও নয়— দস্যু বনহুরেরই কাজ। সে এখন দস্যুতা ত্যাগ করে নাকি নারীহরণ শুরু করেছে।

কথাটা এক সময় রহমানের কানে এসে পৌছল। জনসাধারণের ধারণা এবং পুলিশমহলেরও সন্দেহ এটা দস্যু বনহুর ছাড়া আর কারও কাজ নয়।

দস্যু হলেও রহমান মানুষ, কথাটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল সে। সত্য হলে সে কিছুই মনে করত না কিন্তু এত বড় একটা মিথ্যাকে সে কি করে স্বীকার করবে! তাদের সর্দারের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে এ কুৎসিত ধারণা রহমানকে ব্যথিত করে তুলল।

সেদিন বনহুর তার বিশ্রামকক্ষে অর্ধশায়িত অবস্থায় উদাস মনে কি যেন চিন্তা করছিল। নূরী পাশে এসে বসল, বলল—হুর কি ভাবছ?

বনহুর মৃদু হেসে বলল— কিছু না।

আজকাল বনহুর নূরীর সম্মুখে কোন সময় নিজেকে ভাবাপন্ন বা উদাসীন রাখে না। যতটুকু পারে নিজেকে সংযত রেখে নূরীর সাথে হাসি-খুশিভাবে কথাবার্তা বলে। নূরী সত্যি তাকে কত ভালবাসে, মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করেছে সে। নূরী তাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে। আর মনিরার কথা স্মরণ হতেই তীব্র ঘৃণা তার সমস্ত মনকে বিষিয়ে তোলে। মনিরা তাকে ভালবাসার নামে মিথ্যা ছলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল। অবিশ্বাসিনী মনিরা ---একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বনহুরের হৃদয়কে নিষ্পেষিত করে চলে। বনহুর যতই মনিরার স্মৃতি ভুলে যাবার চেষ্টা করে ততই যেন তার মুখখানা বারবার ভেসে ওঠে মনের আকাশে। তাই বনহুর আজকাল প্রায়ই নূরীকে নিজের পাশে পাশে রাখে, নূরীকে দিয়ে ভুলে যেতে চায় মনিরাকে।

বনহুরের সংস্পর্শে নূরী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। আবার তার জীবনধারা হয়েছে স্বচ্ছ স্বাভাবিক। হাসি-গানে মুখর হয়ে উঠেছে নূরী!

নূরীর জন্য ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল বনহুর, এখন সে চিন্তা আর নেই। নূরী আবার স্বাভাবিক জীবন লাভ করেছে— এটা তার চরম আনন্দ। তাই বনহুর কোন সময় নূরী মনে ব্যথা পায়— এমন ধরনের কথা বলে না বা সে ধরনের কাজ করে না।

নূরীর আগমনে বনহুর মনের চিন্তা দূরে ঠেলে দিয়ে বলল—নূরী, তুমি আমাকে অনেক ভালবাস, না?

নূরী বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে অভিমানভরা কণ্ঠে বলল— এ কথা তুমি আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা কর কেন?

শুনতে ভাল লাগে নূরী।

কি জানি, এবার ফিরে আসার পর তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।

কেমন হয়ে গেছি নূরী? মন্দ না ভাল?

অনেক ভাল।

বেশ।

তার মানে।

মানে তোমার ভাল লাগাই যে, আমার ভাল লাগা, আমার আনন্দ নূরী। যাক, চলো একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

নূরীর হাত ধরে বনহুর তার পাতালপুরীর গোপন আস্তানা থেকে সুড়ঙ্গপথে এগুতে থাকে।

হাজার ফিট মাটির তলায় দস্যু বনহুরের গোপন আস্তানা। কান্দাই বনে আস্তানা থাকাকালীন বনহুর এ ভূগর্ভে গোপন আস্তানা তৈরি করেছিল। লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে এ আস্তানা তৈরি করতে!

বনহুরের এ আস্তানা এমন জায়গায় যেখানে কোনদিন পুলিশ বা সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। অদ্ভুত কৌশলে তৈরি এ আস্তানাটি।

মিঃ জাফরী যখন পুলিশ ফোর্স নিয়ে বনহুরকে কান্দাই বনের আস্তানায় হামলা করেছিলেন, তখন বনহুর তার এই পাতালপুরীর গোপন আস্তানায় নিশ্চিন্ত মনে সরে পড়েছিল। মিঃ জাফরী এবং তাঁর দলবল অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও বনহুরকে খুঁজে পাননি।

এই সেই আস্তানা।

নূরী আর বনহুর যখন বাইরে এসে পৌঁছল তখন পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। বনের পাতার ফাঁকে ফাঁকে উকি দিচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ, পূর্ণচন্দ্রের জোছনার আলো বনভূমিতে সোনালী আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। একটা নির্মম স্নিগ্ধ হাওয়া সাদর সম্ভাষণ জানাল নূরী আর বনহুরকে। বনহুরের শরীরে স্বাভাবিক ড্রেস। সাদা ধবধবে পাজামা আর পাঞ্জাবী। বড় সুন্দর লাগছিল ওকে। পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে বনহুর আর নূরী!

অদূরে পাহাড়িয়া নদী কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে।

বনহুর আর নূরী নদীতীরে এসে দাঁড়াল। নদীর উচ্ছল জলরাশির বুকে জোছনার রূপালী আলোর ছ'টা নেচে নেচে এগিয়ে চলেছে। কতগুলো পদ্মফুল দোল খাচ্ছে সেই রূপালী আলোর বন্যায়। অপূর্ব দৃশ্য!

বনহুর আর নূরী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক অপরূপ দৃশ্য তাকিয়ে দেখতে লাগল। মাথার ওপর অনন্ত আকাশ। চারপাশে বৃক্ষরাজি। সামনে পাহাড়িয়া নদী।

নূরীর দক্ষিণ হাতখানা বনহুর হাতের মুঠোয় চেপে ধরল, তারপর আবেগভরা কণ্ঠে ডাকল–নূরী!

এমন করে বনহুর কোনদিন তাকে ডাকেনি। নূরীর মনে দোলা লাগল। নূরী ছোটবেলা থেকে ওকে দেখে এসেছে; কিন্তু আজ যেন নতুন করে দেখতে পাচ্ছে। কি বলতে চায় সে তাকে? নূরী জবাব দেয়—বল?

নূরী, মেয়েরা সব পারে, না?

নূরী হেসে বলল—ভাত রাঁধা থেকে দস্যুবৃত্তি পর্যন্ত সব পারে।

তা বলছি না নূরী।

তবে কি?

নারী ছলনাময়ী–এ কথা সত্যি, না?

কেন, আমি কি তোমার সঙ্গে কোনরকম ছলনা করেছি? অভিমানে নূরীর কণ্ঠ ভরে ওঠে।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল—একমাত্র তুমিই সত্য নূরী। তোমার ভালবাসাই সত্য----

নূরী বনহুরের বুকে মাথা রেখে মধুর কণ্ঠে বলল–এত দিনে তোমার মনের কথা পেলাম হুর! তোমার অন্তরের কথা পেলাম!

বনহুর আর নূরী নদীতীরে কোমল দুর্বাঘাসের ওপর বসল। কতদিন পর আবার তারা এভাবে নদীতীরে বসার সুযোগ লাভ করল। বনহুর নূরীর চিবুক উঁচু করে ধরে বলল–নূরী, সেই গানটা এবার গাও , যে গানটা তুমি আগে গাইতে।

নূরীর মনে আনন্দের উৎস, বনহুরকে এত আপন করে সে যেন কোনদিন পায়নি। যতই সে ওকে নিজের করে পেতে চেয়েছে ততই যেন বনহুর সরে গেছে দূরে, আরও দূরে। আজ নূরী গায় গান, অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে গায়।

নূরীর গানের সুর শুধু বনহুরের মনেই দোলা জাগায় না, দোলা লাগে ঘন বনের শাখায়, দোলা লাগে জোছনাভরা পাহাড়িয়া নদীর উচ্ছল জলরাশির বুকে। দোলা জাগে প্রকৃতির বুকে।

বনহুর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে নূরীর মুখের দিকে। নূরী বনহুরের হাতখানা তুলে নেয় নিজের হাতে।

❑

জটাজুটধারী দু'জন সন্ন্যাসী দ্রুত পাহাড়িয়া পথ ধরে গহন বনের দিকে এগুচ্ছে। শরীরে তাদের ভস্মমাখা। ললাটে চন্দনের তিলক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দক্ষিণ হাতে লোহার চিমটা। দু'জনের কাঁধেই এক একটা ঝোলা। সামনের সন্ন্যাসীর হাতে ঝোলার মধ্যে মনিরার নয়নের মনি নূর।

নূরকে দুধের সঙ্গে সামান্য ঘুমের ঔষধ খাইয়ে দেয়া হয়েছে। তাই নূর ঝোলার মধ্যে অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

সন্ন্যাসীদ্বয় দ্রুত এগুচ্ছে।

পূর্ণিমা রাতের তৃতীয় প্রহরে তাদের মা কালিকা পূজা। প্রতি পূর্ণিমা রাতেই এই সন্ন্যাসীদ্বয় যেখান থেকে হোক একটি নরশিশু সংগ্রহ করে আনে। গহন বনের মধ্যে বাস করে এক কাপালিক সন্ন্যাসী। তার সামনেই হাজির করে ওরা সেই শিশুকে। কাপালিক ঐ শিশুকে কালীর চরণে সমর্পণ করে সিদ্ধিলাভ করে। শিশুটিকে কালীদেবীর সামনে বলি দেয়া হয়, তারপর সেই রক্ত এক নিঃশ্বাসে পান করে কাপালিক। তখন তার সাধনা জয়যুক্ত হয়।

প্রতি মাসে যেখান থেকেই হোক একটি নিখুঁত শিশু তাদের চাই। এবং সে শিশুর শরীরে কোন সংকেতপূর্ণ চিহ্ন থাকতে হবে।

এই নর-রক্তপিপাসু কাপালিকের জন্য প্রতি মাসে পূর্ণিমা রাতে কালীপূজার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এ ধরনের নিখুঁত এবং শরীরে কোনো সংকেত চিহ্নযুক্ত শিশু সংগ্রহ করে আনার জন্যই এই সন্ন্যাসীদ্বয় অহরহ ঘুরে বেড়ায়।

চুরি করে হোক, দস্যুতা করে হোক, অর্থ দিয়ে হোক, শিশু তাদের চাই!

এবার বহু অনুসন্ধান করেও পূর্ণিমা রাতের কালী পূজার জন্য কোন শিশু সংগ্রহ করতে না পারায় সন্ন্যাসীদ্বয় বিফল মনে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ একটা লোকের কোলে নূরকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল সন্ন্যাসীদ্বয়। তারপর ওর পিছু লেগেছিল, এবং নূরকে বহু টাকা দিয়ে কিনে নেয় ওরা।

অবিরাম গতিতে পথ চলছিল সন্ন্যাসীদ্বয়।

ঝিন্দ শহর থেকে বসুন্ধরা পর্বত, তারপর ভগগদিয়া নদীতীর, তারপর আরও কত বন-পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করে সন্ন্যাসীদ্বয় এগিয়ে চলেছে।

মাঝে কয়েকদিন কেটে গেছে।

নূর জেগেছিল, একবার নয়, কয়েক দিনের মধ্যে অনেকবার—আবার তাকে ঔষধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

অবোধ শিশু নূর জাগলেই কাঁদতে শুরু করে। মায়ের জন্য চারদিকে তাকায়, কথা সে বলতে শেখেনি এখনও। বয়স মাত্র আট-ন' মাস হবে। শুধু মাকেই চিনেছিল সে।

ঘুমের ওষুধের গুণ নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই জেগে ওঠে নূর। কাঁদতে শুরু করে, তখন নরপিশাচদ্বয় আবার তাকে কিছু দুধ খাইতে দেয়, সঙ্গে থাকে একটু ঘুমের ওষুধ। চতুর শয়তানদ্বয় লক্ষ্য রাখে, যেন শিশুর কোন ক্ষতি না হয় বা মরে না যায়। তাহলে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাপালিক বাবাজীর পূজা না হলে তাদের গর্দান যাবে। কাজেই নূরের যেন কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকে ছিল সন্ন্যাসীদ্বয়ের নিপুণ দৃষ্টি।

❑

এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশ।

বন, নদী, প্রান্তর, পাহাড়, পর্বত পেরিয়ে সন্ন্যাসীদ্বয় তাদের কাপালিকের আশ্রয়ে পৌঁছতে সক্ষম হল। আজ দোল পূর্ণিমা। নরশিশুর রক্তে কাপালিক তার কালীমায়ের চরণ রাঙা করবে।

সন্ধ্যা থেকে কাপালিকের সাধনা শুরু হয়েছে। সবাই নরবলি দিয়ে থাকে অমাবশ্যা রাতে, আর এই কাপালিক নরবলি দেয় পূর্ণিমা রাতে। তার কালীমায়ের নাকি নির্দেশ রয়েছে।

কাপালিকের যজ্ঞ শুরু হবার মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে এই সন্ন্যাসীদ্বয় নূরকে নিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। বড়ই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে সন্ন্যাসীদ্বয়। এ ক'দিন অবিরাম পথ চলেছে তারা।

নূরকে দেখে কাপালিক খুশি হল।

কিছুক্ষণ পূর্বেই কাপালিকের চোখমুখ হতাশায় ভরে উঠেছিল। এবার বুঝি তার যজ্ঞ নষ্ট হয়ে যাবে! সন্ধ্যা আগতপ্রায়, তবু তো কোন শিশু নিয়ে তার অনুচরদ্বয় ফিরে এলো না। এক্ষণে তার মনমত শিশু পেয়ে আনন্দে কাপালিকের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে ওঠে। তার চেয়েও শুভ নিদর্শন শিশুর হাতে মঙ্গলজট রয়েছে। এবারের নরবলি মা কালী মনপ্রাণে গ্রহণ করবেন!

যজ্ঞ শুরু হয়েছে।

ভস্মমাখা কাপালিকের সামনে প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ড দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। বেদীর ওপর জমকালো পাথরের তৈরি কালীমূর্তি। দক্ষিণ হাতে সুতীক্ষ্ণধার খর্গ, বাম হাতে নরমুন্ডু। অন্য দুটি হাতে শঙ্খ আর চক্র রয়েছে। লকলকে রক্তরাঙা একটি জিহ্বা। চোখ দুটি সোনার তৈরি। অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান জিহ্বা। উজ্জ্বল আলোয় কালীর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

মাথায় জট, শরীরে বাঘের চামড়াপরা কাপালিক অদ্ভুত শব্দে মন্ত্র পাঠ করে চলেছে। বাঘের চামড়ার ওপর বসা রয়েছে সে।

সামনের বেদীর ওপর অন্য এক সন্ন্যাসী শিশু নূরকে কোলে করে বসে আছে। নূর দু'হাত নেড়ে খেলা করছে। অত্যন্ত নিদ্রার জন্য এখন তার চোখের ঘুম চলে গেছে। এখানে পৌছার পরই খুব কেঁদেছিল, সন্ন্যাসীদ্বয় জোর করে বেশ কিছুটা দুধ ওকে খাইয়ে দিয়েছে, তাই চুপচাপ খেলা করছে।

নূরের অপূর্ব সুন্দর নাদুস-নুদুস চেহারা দেখে কাপালিকেরই জিভে পানি এসে যাচ্ছিল। মা কালীর জিভে যে রস আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাপালিক খুশিতে ডগমগ হয়ে মন্ত্রপাঠ করছে।

রাত দ্বিপ্রহর তখন, যজ্ঞশেষে নূরকে কালী দেবীর চরণে বলি দেয়া হবে।

অগ্নিকুন্ডের উজ্জ্বল আলোতে গোটা বনভূমি আলোকিত হয়ে উঠেছে। আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে ধূপের গন্ধে। সে এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখন সেখানে।

সন্ন্যাসীর কোলে নূর এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

কচি হাতখানা ঝুলে পড়েছে একপাশে। মাথাটা কাৎ হয়ে সন্ন্যাসীর বুকে লেগে রয়েছে। স্বপ্নের ঘোরে নূর ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। কখনও বা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নূরের কচি মুখখানা পবিত্র ফুলের মত সুন্দর লাগছে।

সন্ন্যাসী বাবাজী মন্ত্রপাঠ করে চলেছে।

❑

এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ হুর? রাত কত হল জান, চল এবার ফেরা যাক।

তাজের পিঠে বসে নূরী আর বনহুর ছুটে চলেছে অজানার পথে। নূরী বনহুরের দক্ষিণ হাতের ওপর হাত রেখে কথাটা বলল।

বনহুরের দক্ষিণ হাতে তখন তাজের লাগাম ধরা রয়েছে, বাঁ হাতে নূরীকে ধরে রেখেছে সে।

জোছনাভরা পৃথিবী।

বনহুর আর নূরীর মধ্যে নদীতীরে বসে বসে গল্প হচ্ছিল। বনহুর বলছিল—চল নূরী দূরে-অনেক দূরে কোথাও যাই।

নূরী বলেছিল-কোথায় যাবে হুর?

যেদিকে দু'চোখ যায় চল সেইদিকে যাই।

বনহুরের প্রস্তাবে নূরী অমত করতে পারেনি।

তাজের পিঠে বনহুর আর নূরী উঠে বসেছিল। জোছনাভরা রাত। আলোর বন্যায় বসুন্ধরা যেন স্নান করে চলেছে।

বনহুর আর নূরী তাজের পিঠে ছুটে চলেছে! রাত বেড়ে আসছে সেদিক খেয়াল নেই কারও। হঠাৎ বলে উঠল নূরী—হুর, এখন রাত গভীর, চল ফেরা যাক।

উঁহু, আজ আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না নূরী।

আমারও না। তবে আর কত দূর যাবে শুনি?

যতদূর মন চায়।

বেশ চল।

আজ মনিবের আনন্দে অশ্ব তাজও যেন আত্মহারা। দিশেহারা ভাবে সেও এগুচ্ছে। কোন বাধাবিঘ্নই আজ তাজের পথ রোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

প্রান্তর ছাড়িয়ে এবার এক নতুন বনে প্রবেশ করল বনহুরের অশ্ব। নূরী বলল—অজানা অচেনা এক বনে এত রাতে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না হুর।

কেন, ভয় হচ্ছে তোমার?

না, তুমি তো জান, আমার হুর পাশে থাকলে আমি যমকেও ভয় করি না।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর বলে উঠল—নূরী, দেখ বনের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে।

বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল নূরী—দূরে, অনেক দূরে গভীর বনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে জ্বলন্ত আগুনের শিখা। নূরী বলল—চল হুর। আর যেয়ে কাজ নেই।

কিন্তু ওখানে অমন আগুন জ্বলছে কেন?

হয়তো কোন শিকারীর দল শিকার করতে এসে বনের মধ্যে রাত হয়ে যাওয়ায় আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে নিজেদের হিংস্র জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

তাও হতে পারে কিংবা কোন... যাক, চল দেখে আসি আসল ব্যাপারটা কি!

আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, যদি শিকারীদল না হয়ে অন্য কোন দস্যুদল হয়?

মোকাবিলা হবে।

তুমি যে নিরস্ত্র?

ততক্ষণে বনহুরের অশ্ব অগ্নিকুন্ড লক্ষ্য করে দ্রুত এগুতে শুরু করেছে।

বনহুর আর নূরী যতই এগুচ্ছে ততই অগ্নিকুণ্ড স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

এবার বনহুর অশ্বের গতি কমিয়ে নিল।

কারণ সে জানতে চায় কিসের আগুন ওটা, কে বা কারা রয়েছে সেখানে? অশ্বপৃষ্ঠ থেকেই এবার লক্ষ্য করল অগ্নিকুণ্ডের পাশে একজন জটাজুটধারী বসে আছে। আর দু'জন দাঁড়িয়ে, কি যেন করছে ওরা।

হঠাৎ নূরী তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—হুর দেখ, দেখ, একটা ছোট্ট শিশুকে একজন উবু করে ধরে আছে।

চমকে উঠল বনহুর, এতক্ষণ সে তা লক্ষ্যই করেনি। ওপাশে এক সন্ন্যাসী একটি শিশুকে উবু করে ধরে রয়েছে। আর এক জন একটা খর্গ তুলে ধরেছে। হয়তো এক্ষুণি শিশুটাকে হত্যা করা হবে! যে সন্ন্যাসী মন্ত্রপাঠ করছে তার সামনে বেদীর ওপর একটা জমকালো কালিমূর্তি।

বনহুর মুহূর্তে বুঝে নিল ব্যাপারটা, সে নূরীকে লক্ষ্য করে বলল—নূরী, তুমি এখানে থাক। তারপর অশ্ব থেকে নেমে দ্রুত অগ্নিকুণ্ডের নিকটে অগ্রসর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খর্গধারী সন্ন্যাসীটার ওপর।

আচমকা আক্রমণে খর্গধারী উবু হয়ে পড়ে মাটিতে। ছিটকে পড়ল ওর হাতের খর্গ।

বনহুর খর্গধারীর বুকে চেপে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে কাপালিকের মন্ত্র থেমে গেল, চট করে উঠে কুড়িয়ে নিল ভূপতিত খর্গখানা, ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের ওপর।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর লাফিয়ে সরে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে কাপালিকের হাতের সুতীক্ষ্ণধার খর্গ বিদ্ধ হলো ভূপতিত সন্ন্যাসীর মাথায়। দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল সন্ন্যাসীর মাথাটা। রক্তের বন্যা ছুটলো, টু শব্দ করার মত সময় পেল না সে।

প্রথম সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে দ্বিতীয় সন্ন্যাসী নূরকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, বনহুর তাকে ধরে ফেলল, তারপর প্রচণ্ড এক ঘুষিতে ধরাশায়ী করল।

কাপালিক তার অনুচরটির রক্তাক্ত দ্বিখণ্ডিত মাথাটার দিকে তাকিয়ে একটু হকচকিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর বেদীর ওপর উঠে কালীমূর্তির হাত থেকে ধারালো খর্গটা তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশালদেহী কাপালিকের ওপর।

সে কি ভীষণ ধস্তাধস্তি!

রক্তপিপাসু কাপালিকের শরীরে কি অসীম শক্তি। বনহুর তাকে সহজে কাবু করতে সক্ষম হচ্ছে না। কাপালিকের হাতে পূর্বের খড়গটা রয়েছে। কাপালিক আঘাত করছে বনহুর, তার খড়গ দ্বারা প্রতিরোধ করে চলেছে। বনহুরের আঘাতও অতি কৌশলে প্রতিরোধ করছে কাপালিক!

ওদিকে নূর মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। মুখটা তার কাপড় দিয়ে বাঁধা, কাঁদবার শক্তি নেই।

অপর সন্ন্যাসী এই সুযোগে পুনরায় সরে পড়ার চেষ্টা করতেই নূরী তার খোপা থেকে বিষযুক্ত সুতীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র ছোরাখানা তুলে নিয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল।

নূরীর লক্ষ্য অব্যর্থ, ক্ষুদ্র ছোরাখানা আমূল বিদ্ধ হল পলাতক সন্ন্যাসীর পিঠে। একটা তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীটি। কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় ছটফট করে স্থির হয়ে গেল তার দেহটা।

নূরী নিজেকে রক্ষার জন্য সদাসর্বদা একটি বিষযুক্ত তীক্ষ্ণধার ছোরা রাখে নিজের খোঁপায় গুজে। বিপদে পড়লে সে ওটা ব্যবহার করে। আজ নূরীর বিষযুক্ত ছোরাখানা খুব কাজে লাগল।

যতই শক্তিশালী লোকই হোক না কেন, দস্যু বনহুরের কাছে পরাজয় বরণ না করে উপায় নেই। নররক্তপিপাসু কাপালিক বনহুরের হাত থেকে বেশিক্ষণ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হল না। বনহুরের হাতের খড়গ তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল।

বিরাট জটাজুটভরা মাথাটা কাপালিকের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল দূরে। রক্তে রাঙা হয়ে গেল বনভূমি।

অগ্নিকুন্ডটা তখনও দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

শক্তিশালী কাপালিকের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বনহুর অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছিল। সাদা পাঞ্জাবীটা ঘামে ভিজে চুপসে উঠেছে। স্থানে স্থানে ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। কোথাও বা রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। পাজামার অবস্থাও তাই। বনহুর বাঁ হাতে ললাটের ঘাম মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বনহুরের নিঃশ্বাস তখনও দ্রুত বইছে। চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে।

নূরী অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে ছুটে এসে বুকে তুলে নিল নূরকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল বনহুরের পাশে–হুর, শিগগির এর মুখের বাঁধন খুলে দাও।

বনহুর তার হাতের সুতীক্ষ্ণধার খড়গ ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। তারপর দ্রুতহস্তে শিশুর মুখের বাঁধন খুলে দিল!

মুখের বাঁধন মুক্ত হওয়ায় চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল শিশু নূর।

অগ্নিকুন্ডের উজ্জ্বল আলোতে বনহুর আর নূরী শিশুর অপরূপ সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হল। নূরী বুকে আঁকড়ে ধরে সস্নেহে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলল–দেখ, দেখ–কি সুন্দর শিশুটি।

যদিও বনহুরের শরীর-মন দু'ই ক্লান্ত তবু নূরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি জাগল তার মনে, বড় মায়া হলো। শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল–ভাগ্যিস ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম নূরী, তাই রক্ষে। নইলে এতক্ষণ এর দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..যেমন ঐ পাপিষ্ঠ কাপালিক সন্ন্যাসীর মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। বনহুর তাকাল সন্ন্যাসীদের মৃতদেহের দিকে।

নূরী বলল—এ কারণেই বুঝি তোমার মন আজ এখানে টেনে নিয়ে এসেছিল?

সত্যি নূরী, অদ্ভুত এ ব্যাপার। জানি না একি কাণ্ড, আজ কেন আমার মন আমাকে এভাবে গহন বনের মধ্যে এই স্থানে টেনে আনল!

নূরী শিশুটাকে বুকে চেপে ধরে বলল—সবই খোদার লীলা!

শিশু নূর তখন নূরীর বুকে মুখ লুকিয়ে শান্ত হয়ে এসেছে। ভাবছে এতক্ষণে সে তার মাকে ফিরে পেয়েছে।

বনহুর আর নূরী ফিরে চলল।

নূরীর কোলে শিশু।

বনহুর এবার সংযতভাবে অশ্ব চালনা করছে।

পেছনে পড়ে রইলো বটবৃক্ষতলে পাষাণ প্রতিমা কালী দেবীর জমকালো মূর্তি। তার পদতলে তিনটি সন্ন্যাসীর রক্তমাখা দেহ— রক্তপিপাসু মা কালী দেবী আজ শিশুর রক্ত পান না করে করলো তার ভক্তদের রক্তপান!

❑

এদিকে নূরকে যখন বলির জন্য প্রস্তুত করে নেয়া হচ্ছিল ঠিক তখন ঝিন্দ শহরের একটি গোপন কক্ষে বন্দিনী মনিরা পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখির মত ছটফট করছিল। মায়ের মনে একটা ভীষণ আলোড়ন শুরু হয়েছিল। কেন যেন মনের মধ্যে ভীষণ চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল। বার বার নূরের কচি মুখখানা ভেসে উঠছিল তার মানসপটে। মনিরা কি করবে, কি করে মনকে শান্ত করবে, তাই খোদার কাছে তুলে দোয়া চাইতে বসেছিল, হে দয়াময়, আমার নূরকে তুমি রক্ষা কর। তুমি ছাড়া ওকে দেখার কেউ নেই। হে করুণাময়, তুমি আমার নূরকে বাঁচিয়ে নিও...

মনিরা যখন সন্তানের মঙ্গল কামনায় খোদার কাছে করুণা ভিক্ষা করছিল তখন নদীতীরে নূরীর পাশে বসে বনহুরে মন উতলা হয়ে উঠছিল। বসে থাকতে মোটেই ভাল লাগছিল না। তাই নূরীকে নিয়ে তাজের পিঠে বসেছিল। একটা অজানিত টানে ছুটে চলছিল বনহুর কোন্ অজানার পথে।

গহন বনে কাপালিক সন্ন্যাসীর কোলে বলির জন্য অসহায় নূর। খড়গহস্তে দণ্ডায়মান সন্ন্যাসী। মন্ত্রপাঠরত রক্তপিপাসু কাপালিক। সামনে জমকালো কালীমূর্তি, লকলকে জিহ্বা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে।

অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে আসছে বনহুর আর নূরী।

বদ্ধকক্ষে অশ্রুসিক্ত নয়নে দু'হাত তুলে দোয়া করছিল মনিরা।

সবকিছুর সঙ্গে একটা অদ্ভুত সংযোগ ছিল। অপূর্ব সে যোগাযোগ। কখন যে মনিরা জায়নামাযের ওপর ঢলে পড়েছে খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙতেই সূর্যের আলো তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল পাশের ক্ষুদ্র জানালাটা

দিয়ে। ভোরের সূর্যের এক টুকরা আলো এসে পড়ছিল তার মুখে। মনিরা হৃদয়ে যেন একটা শান্তি অনুভব করল।

মনিরা জায়নামায থেকে উঠে দাঁড়াল। আজ যেন মনটা তার অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। ওখান থেকে আকাশের যতটুকু দেখা যায় প্রাণভরে তাই দেখতে লাগল। ঐ আকাশের তলায় কোথাও রয়েছে তার নূর।

মনিরা যখন ক্ষুদ্র জানালায় দাঁড়িয়ে নূরের কথা ভাবছে, তখন নূরকে নিয়ে বনহুর আর নূরী মেতে উঠেছে।

শিশু নূরকে কোলে করে বনহুরের শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল নূরী, হেসে বলল–দেখ হুর কে এসেছে!

হাই তুলে গা মোড়া দিয়ে চোখ মেলে তাকাল বনহুর—কে?

নূরী হেসে বলল–মনি।

মুহূর্তে বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর থমথমে হয়ে পড়ল, মুখ ফিরিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। মনি তার মনিরাকেও সে মনি বলে ডাকত। একটা ঘৃণা তার সে নামকে চিরতরে বিষাক্ত করে দিয়েছে। মনিরা ব্যভিচারিণী, ভ্রষ্টা, অন্যের সন্তান তার পেটে জন্মগ্রহণ করেছে। মনিরা তাই চিরদিনের জন্য মুছে গেছে তার মন থেকে....

নূরী হেসে বলল–কি হলো হুর? অমন গম্ভীর হয়ে পড়লে কেন? এ নামটা তোমার পছন্দ হলো না বুঝি?

বনহুর এবার মুখ তুলে তাকাল নূরীর দিকে। দিনের আলোয় স্পষ্টভাবে এই প্রথম সে দেখল নূরকে। বড় ভাল লাগল ওকে। হাত বাড়িয়ে নূরের হাতখানা ধরে মৃদু নাড়া দিয়ে বলল–না জানি কার সন্তান, কে ওর বাবা-মা। নূরী, কেন মায়া বাড়ছে?

সেকি হুর, তুমি একি বলছ! যারাই ওর বাবা-মা হোক আমরা তো; আর চুরি করতে যাইনি বা কেড়েও আনিনি। নিয়তির চক্রে যখন ও আমাদের হাতে এসে পড়েছে তখন বুকে তুলে নেব না? তুমি যাই বলো হুর, মনিকে আমি আর কাউকে দেবো না।

বনহুর এবার রাগত কণ্ঠে বলে উঠল—মনি—মনি—ঐ নাম ছাড়া আর নাম নেই?

কেন এ নাম তোমার এত অপছন্দ? আমার কিন্তু এ নামটা বড় ভাল লাগছে।

বেশ রাখ! গম্ভীর কণ্ঠে বলল বনহুর।

তাই রাখলাম। বলল নূরী।

❑

নূরের নাম বদলে গেল—নাম হলো মনি। নূরীর নয়নের মনি।

মনিকে পেয়ে নূরী আনন্দে আত্মহারা। সদা-সর্বদা ওকে নিয়েই মেতে থাকে সে। নাওয়া, খাওয়া, গোসল করানো, বুকে নিয়ে ঘুম ঘুমপাড়ান যতকিছু সব করে নূরী। মনিকে ছাড়া নূরীর যেন এক মুহূর্ত আর চলে না।

মনিকে পেয়ে বনহুর যে খুশি হয়নি তা নয়। তাদের নীরস জীবনে মনি যেন একটা নতুন আস্বাদ এনে দিয়েছে।

সেদিন নূরী মনিকে নিয়ে আনন্দে মেতে ছিল। কাজল পরিয়ে দুধ খাইয়ে কোলে নিয়ে দোল দিচ্ছিল। এমন সময় বনহুর এসে হাজির হয় নূরীর কক্ষে। মৃদু হেসে বলল—নূরী, মনিকে পেয়ে তুমি দেখছি আমাকে একেবারে ভুলে গেছ?

নূরী মনির মুখে ছোট্ট একটি চুমু দিয়ে দোলনায় শুইয়ে রেখে এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে, দু'হাত বাড়িয়ে বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরে বলল—রাগ করেছ হুর? মনিকে পেয়ে তোমাকে আমি ভুলে যাব—কি যে বলো—তবে ওর জন্য সত্যিই বড় মায়া হয়, ওর তো বাবা-মা কেউ নেই এখানে।

নূরীর চিবুকে মৃদু টোকা দিয়ে বলল বনহুর—তাই তুমিই মা বনে গেছ, না?

হ্যাঁ, তাতে দোষ কি, মেয়েরাই তো মা হয়।

হাসে নূরী, হাসে বনহুর। দোলনায় শুয়ে হাসে মনি, দু'হাত মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে মা, ম্মা, ম্মা!

নূরী বনহুরের গলা ছেড়ে দিয়ে ছুটে যায় দোলনার পাশে, দু'হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় বুকে, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয় রাঙা টুকটুকে ঠোঁট দু'খানা।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ায় সেখানে।

বনহুর বলে—কি খবর রহমান?

কয়েকটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

কথা! বেশ চল। একবার নূরী আর মনির মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায় বনহুর।

রহমানও একবার অলক্ষ্যে নূরী আর মনিকে দেখে নেয়। নূরীর হাসি-খুশিভরা সুস্থ জীবন রহমানের মনে আনন্দ দান করে। নূরীকে রহমান প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাই ওর মঙ্গলই সে চায়। মনির জন্য নূরীর নির্দেশমত সে শহর থেকে অনেক কিছু এনে দিয়েছে। দোলনা, খেলনা, দুধ খাবার বোতল, চুষনী অনেক কিছু। নূরীর মুখে হাসি দেখলে রহমানের বুক খুশিতে ভরে উঠে। প্রাণে সে শান্তি পায়।

নূরী আর মনিকে দেখে নিয়ে বনহুরের পেছনে পেছনে সেও বেরিয়ে যায়।

❑

সর্দার, সবাই জানে, এই নারীহরণ ব্যাপারটা আপনারই কাজ। কিন্তু আমি কথাটা শুনেও এত দিন নিশ্চুপ রয়েছি, আপনার মনের অবস্থা বুঝে বলিনি। এখন আর চুপ থাকতে পারলাম না, কারণ শুধু আপনার বদনামই নয়, এটা দেশ ও দশের এক মস্ত বিপদজনক ব্যাপার।

বনহুর নীরবে রহমানের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল, এবার একটা শব্দ করল—হুঁ।

রহমান বলে চলেছে–সর্দার, শহরে আজকাল নারীহরণ আর ছেলেমেয়ে চুরির যে হিড়িক পড়ে গেছে, এসব নারী এবং ছেলেমেয়ে যাচ্ছে কোথায়?

বনহুর সোজা হয়ে বসে বলল—এটা গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়। রহমান, তুমি আজই আমার অনুচরগণকে শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দাও। যেন শিগগিরই এর সন্ধান সংগ্রহ করে আমাকে জানায়।

আমি এখনই এর ব্যবস্থা করছি সর্দার।

হ্যাঁ, তাই কর।

এতদিন শুধু আপনার আদেশের প্রতীক্ষায়ই ছিলাম। আজ থেকেই আমরা কাজে নেমে পড়ব।

আর শোন।

বলুন সর্দার।

অনেক দিন চৌধুরী বাড়ি যাইনি, যাবার সুযোগ হয়নি। আমার মায়ের কাছে যেতে চাই।

খুব ভাল কথা সর্দার, আমি তাজকে প্রস্তুত করব?

হ্যাঁ, আজ রাতেই যাব মায়ের কাছে—বনহুর উঠে দাঁড়াল।

রহমান তার পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

❑

বিরাট বাড়িখানায় শুধুমাত্র একাকিনী মরিয়ম বেগম। ঝি-চাকর যদিও অনেক রয়েছে কিন্তু তবু মরিয়ম বেগম নিজেকে সব সময় অসহায় নিঃসঙ্গ মনে করেন। বৃদ্ধ সরকার সাহেব রয়েছেন বলেই তিনি আজও বেঁচে আছেন। অসুখে ডাক্তার ডাকেন, সেবা-যত্নের জন্য নার্সের ব্যবস্থা করেন। পথ্যা-পথ্যের সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, চিন্তার সময় সান্ত্বনা দেন।

কিন্তু তিনি পুরুষ মানুষ, কতক্ষণ বিবি সাহেবার পাশে পাশে থাকতে পারেন। সংসারের নানা কাজে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। বিরাট সংসারে কত ঝামেলা সহ্য করে তবেই না চৌধুরী সাহেবের বিষয়-আশয় সবকিছু ঠিক রেখেছেন সরকার সাহেব।

রাজ প্রাসাদের মত বাড়ি, গাড়ি, ঐশ্বর্য, দাস-দাসী কোন কিছুর অভাব নেই মরিয়ম বেগমের, শুধু অভাব সন্তান-সন্ততির। একমাত্র পুত্রকে হারানোর পর মনিরাকে পেয়ে কতকটা সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সেই মনিরাকেও যখন হারিয়ে ফেললেন তখন তাঁর আপন বলে কিছুই রইলো না। সংসার অসহনীয় হয়ে উঠলো তাঁর কাছে। কোনরকমে স্বামী-শোক সহ্য করে চলেছিলেন, মনিরাকে বুকে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন—সেই মনিরাও আজ নেই।

শোকবিহ্বলা মরিয়ম বেগম দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছিলেন। একমাত্র সন্তানকে বহুদিন পূর্বে হারানোর পর ভুলেই এসেছিলেন তার কথা, আবার সেই হারানো রত্ন ফিরে পেয়ে হারানোর ব্যথা আরও গভীরভাবে মরিময় বেগমকে বিচলিত করে তুলেছিল। বেশ ছিলেন তিনি। মনির মরে গেছে, আর তো ফিরবে না। কিন্তু সেই মনিরকে আবার কেন পেলেন, আর পেলেনই যদি তবে তাকে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে না পেয়ে পেলেন অস্বাভাবিকরূপে। যার জন্য সদা ভয় না জানি কখন কোন মুহূর্তে তার জীবন বিনষ্ট হতে পারে। আজ কতদিন তাকে দেখেননি, তার সন্ধান জানেন না, মরে গেছে না বেঁচে আছে তাও তিনি জানেন না। মায়ের প্রাণ তো, অহরহ সদা ঐ চিন্তা–তার মনির এখন কোথায়, কেমন আছে।

সারাটা দিন তবু কেটে যায় নানা কাজ আর ঝি-চাকরের সঙ্গে, রাতে আর সময় কাটতে চায় না। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের ঘুম কোথায় যে পালিয়ে যায় মরিয়ম বেগম নিজেই বুঝতে পারেন না।

সারাটা রাত ছটফট করে কাটে তাঁর। সারা জীবনের নানা কথা ভেসে ওঠে একটার পর একটা করে মনের আকাশে। কত সুখ-দুঃখে ভরা দিন আর রাতের স্মৃতি—স্বামী-সংসার , পুত্রের কথা— মনিরার কথা।

সেদিন অনেক রাতেও যখন চোখে ঘুম এলো না, তখন মরিয়ম বেগম বালিশটা সরিয়ে রেখে উঠে বসলেন। আজ তাঁর বারবার মনে পড়ছে পুত্রের মুখখানা। মরিয়ম বেগম দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, ইলেকট্রিক লাইটের উজ্জ্বল আলোতে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি মনিরকে।

চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা ব্যথা গুমড়ে উঠল তাঁর। নীরবে, অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল বনহুর। গভীর রাতে মাকে তার ছবির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়। বুঝতে পারে তার মায়ের মনের ব্যথা। অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে উঠল বনহুর—মা!

মরিয়ম বেগম চমকে ফিরে তাকালেন।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ছুটে এসে কচি শিশুর মত মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—মা, মাগো!

গভীর আবেগে মরিয়ম বেগম পুত্রকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল, বনহুরের মাথায়। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন মরিয়ম–ওরে নিষ্ঠুর, কোথায় লুকিয়েছিলি এতদিন, একটিবার কি মায়ের কথা স্মরণ হয়নি তোর?

মা, আমি তোমার হতভাগ্য সন্তান। আমি তোমার নরাধম সন্তান। আমাকে তুমি অভিসম্পাত দাও মা। আমাকে তুমি অভিসম্পাত দাও।

এ তুই কি বলছিস? তোকে আমি অভিসম্পাত দেব!

মা, তোমার মত মায়ের সেবা আমি করতে পারি না, একি আমার কম দুঃখ! এর চেয়ে আমার মৃত্যু অনেক ভাল।

মরিয়ম বেগম পুত্রের মুখে হাতচাপা দেন—ওকি কথা বলছিস! আর কোন সময় বলবি না! ওরে, আমি তবে কি নিয়ে বেঁচে থাকব। কেঁদে ফেলেন মরিয়ম বেগম।

বনহুর মাকে সঙ্গে করে খাটের ওপর এসে বসে পড়ল, নিজের রুমালে মায়ের চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলল—কেঁদো না মা। তুমি কেঁদ না! তোমার সন্তান চিরদিন তোমার পাশে বেঁচে থাকবে। বলো মা কেমন ছিলে?

না-মরে বেঁচে আছি বাবা!

ছিঃ ও কথা বলতে নেই মা!

ওরে তুই বুঝবি না আমার হৃদয়ে কি জ্বালা! কই, মনিরার কথা বললি না তো? সে কোথায় আছে, কেমন আছে?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে পড়ল বনহুরের মুখমণ্ডল! ভ্রুকুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মরিয়ম বেগম বললেন—কি, অমন চুপ করে রইলি কেন?

তোমার মনিরা মরে গেছে মা।

মরে গেছে! আমার মনিরা বেঁচে নেই? বলিস কি মনির? আকস্মিক শোকে অধীর হয়ে খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন মরিয়ম বেগম—মনির! মনির! এ তুই কি বলছিস!

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল—মরে না গেলেও সে মরে যাবার মতই। লোক সমাজে তার স্থান নেই।

সে কি, কি বলছিস বাবা? আমি বুঝতে পারছি না তোর কথা?

মনিরাকে তুমি পুত্রবধু করে ভুল করেছিলে মা।

কেন, কি হয়েছে মনির?

আজ আর জানতে চেও না মা। তোমার এবার কি প্রয়োজন বল?

আগে বল আমার মা মনিরা কোথায়? কি হয়েছে তার? কেমন আছে সে ?

মা, এতটুকু জেনে রাখ, তোমার মনিরা পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে।

তবে তাকে নিয়ে এলি না কেন?

এ প্রশ্ন করলে আমি আর আসব না।

আসবি না! মনিরার কথা জিজ্ঞেস করলে আর আসবি না। বেশ, আমি চুপ রইলাম। বুঝেছি তোদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে।

বনহুরও নিশ্চুপ রইল।

মরিয়ম বেগম বনহুরের মাথায়-পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, কতদিন পর পুত্রকে আজ তিনি পাশে পেয়েছেন।

মা-ছেলে অনেক কথা হল অনেক রাত ধরে।

তারপর এক সময় বিদায় গ্রহণ করল বনহুর।

আজ মরিয়ম বেগম হৃদয়ে অনেকটা সান্ত্বনা পেলেন। একটা দুশ্চিন্তা অহরহ মনের মধ্যে গুমড়ে কেঁদে মরছিল, সেটা আর রইলো না! শুধু এখন চিন্তা মনিরার জন্য।

❑

বনহুর মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে তাজের পিঠে চেপে বসল। বহুদিন পর শহরের রাস্তায় আবার ধ্বনিত হলো সেই অশ্বপদ শব্দ খট্ খট্ খট্.....

জমকালো পোশাক পরে বনহুর তাজের পিঠে ছুটে চলেছে। দু'একজন নাগরিকের কানে এসে পৌছল তাজের খুরের শব্দ। কেউ কেউ দেখে ফেলল অন্ধকার রাস্তার বুকে জমকালো অশ্বপৃষ্ঠে কালো একমূর্তি।

পরদিন পত্রিকায় বড় বড় হেডিং এ প্রকাশ পেল "দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাব।"

কথাটা অল্পক্ষণেই মধ্যেই গোটা শহরে প্রচার হয়ে গেল। প্রতিটি নাগরিকের ঘরে পৌছে গেল সংবাদটা। পুলিশ অফিসে বসে পত্রিকা পড়লেন পুলিশ অফিসারগণ। দোকানে, পথে, ঘাটে, মাঠে আবার সেই কথা—দস্যু বনহুরের পুনরায় আবির্ভাব ঘটেছে। ধনবানদের হৃদয় উঠল কেঁপে। দুষ্ট নাগরিকদের মনে জাগল আশঙ্কা।

নগরবাসী নারীহরণ এবং শিশুচুরি ব্যাপার নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সকলের মুখেই ঐ কথা, যুবতী মেয়ে হরণ–এটা আর কারও নয়, দস্যু বনহুরের কাজ। এবার দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাবে সন্দেহটা একেবারে বদ্ধমূল হলো। নারীহরণ করেও বনহুরের তৃপ্তি হচ্ছে না, সে আবার নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে।

বিশিষ্ট ধনবান ব্যক্তি যাদের প্রচুর অর্থ রয়েছে তারা পুলিশের সাহায্য চেয়ে বললেন। যাতে তাদের ধনসম্পদ দস্যু বনহুরের কবল থেকে রক্ষা পায়, এটাই তাদের একমাত্র কামনা।

আজকাল যুবতী নারীরা সন্ধ্যার পর বাড়ি ছেড়ে আর বাইরে তো যায়ই না, অন্দরমহলেও সদা আশঙ্কা নিয়ে বাস করে।

পুলিশ অফিসে বসে মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন সেদিনের পত্রিকা দেখছিলেন। দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাব শুধু নগরবাসীর মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করেনি, পুলিশমহলেও একটা আলোড়ন জেগেছে।

মিঃ হারুন বলেন—ব্যাপারটা যত সহজই মনে করুন না কেন, আসলে তা নয়। এখনই একবার মিঃ জাফরীর নিকট গিয়ে পরামর্শ করা প্রয়োজন। শহরের মধ্যে যখন দস্যু বনহুরকে সশরীরে দেখা গেছে তখন নিশ্চয়ই সে শুধু শুধু আসেনি, কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে।

মিঃ হারুনের কথায় বললেন মিঃ হোসেন–মিঃ জাফরীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া একান্ত দরকার।

তখনই মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

মিঃ জাফরীর ওখানে পৌঁছে দেখলেন শহরের ধনকুবের হাবসী মিয়া বসে আছেন। তার সঙ্গে মিঃ জাফরীর কোন গোপন কথাবার্তা চলছে।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন পৌঁছতেই হাবসী মিয়া একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন।

মিঃ জাফরী হেসে বললেন–আপনি নিঃসন্দেহে কথাবার্তা বলুন, এরা আমাদের পুলিশের লোক।

অবশ্য মিঃ হারুন এবং হোসেনের শরীরে তখন সাধারণ ড্রেস ছিল।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেনের সঙ্গে হাবসী মিয়ার পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ জাফরী।

হাবসী মিয়ার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিংবা কিছু বেশিও হতে পারে। জাতিতে তিনি কাফ্রি। তিনি কাঠের ব্যবসা করে এদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেক টাকা-পয়সা করে ফেলেছেন। আফ্রিকা থেকে তিনি প্রচুর কাঠ নিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন দেশে চালান দিয়ে থাকেন।

হাবসী মিয়া আগে থেকেই দস্যু বনহুরের নামে আতঙ্কগ্রস্ত থাকতেন, এক্ষণে দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাবে ভড়কে গেছেন। সর্বদা তাঁর ভয়, না জানি কোন্ সময় দস্যু বনহুর তাঁর ওপর হামলা করে বসবে। তাই গোপনে তিনি মিঃ জাফরীর নিকটে সাহায্য চাইতে এসেছেন।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলার পর বিদায় গ্রহণ করলেন হাবসী মিয়া।

হাবসী মিয়া বিদায় গ্রহণ করার পর মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন মিঃ জাফরীর সামনে জেকে বসলেন।

মিঃ জাফরী বলেন—জানি আপনারা কেন এসেছেন। কিন্তু আপনারা জানেন কি ইনি কে?

মিঃ হারুন বললেন—ইনি কে সে পরিচয় তো আপনিই দিয়েছেন স্যার।

না, এটাই এর আসল পরিচয় নয় মিঃ হারুন।

তবে?

ইনি কে পরে জানতে পারবেন। তবে এঁকে ভালভাবে চিনে রেখেছেন তো?

হ্যাঁ স্যার, রেখেছি।

মিঃ জাফরী বলেন—ইনি কাঠের ব্যবসার নামে এখানে কোন চোরা কারবার শুরু করেছেন এবং এর সঙ্গেই যোগাযোগ রয়েছে দস্যু বনহুরের।

তাই নাকি স্যার? বললেন মিঃ হোসেন।

মিঃ জাফরী একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন—লোকটা নিখুঁত অভিনয় করতে পারে।

মিঃ হারুন বললেন–লোকটা নাকি এদেশে অনেক দিন থেকে ব্যবসা করছে, সে এতদিন পুলিশের সাহায্য কামনা করল না, অথচ আজ....

এটাই তো দস্যু বনহুরের একটা চালাকি!

তাহলে হাবসী মিয়া দস্যু বনহুরের লোক?

এতে কোন সন্দেহ নে। ওর কথাবার্তায় সেই রকমই আমার সন্দেহ হয়েছে। তাহলে ওকে আমাদের এরেস্ট করা উচিত ছিল; বললেন— মিঃ হোসেন।

মিঃ হারুনই মিঃ হোসেনের কথার জবাব দিলেন, বললেন—যতক্ষণ উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ কাউকে এরেস্ট করা সম্ভব নয় মিঃ হোসেন।

এমন সময় হাবসী মিয়া হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করেন।

একসঙ্গে চমকে উঠলেন মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন।

মিঃ হাবসী মাথার ক্যাপটা খুলে পুনরায় অভিবাদন জানিয়ে বললেন–স্যার, আমার সিগারেট কেসটা ফেলে গেছি।

সবাই একসঙ্গে তাকালেন টেবিলে। দেখতে পেলেন সোনালী রঙের একটা সিগারেট কেস পড়ে রয়েছে।

হাবসী মিয়া দ্রুত হস্তে সিগারেট কেসটা হাতে দিয়ে পুনরায় বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

❑

মনিরার কক্ষে ইতোমধ্যে আর চার-পাঁচজন যুবতী এসেছে। সবাই ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের তাতে সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যে সুফিয়া নামের মেয়েটিকে না জানি কোথায় চালান করে দেয়া হয়েছে। সেদিনের কথা মনিরার মনে এখনও গভীরভাবে দাগ কেটে রয়েছে। হঠাৎ একদিন এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে বিরাট বপুধারিণী মহিলাটি এসে উপস্থিত হল—তাদের মধ্যে নিম্নস্বরে কিছু আলোচনা হলো। মনিরার হৃদয়ে তখন ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছিল–কে জানে আজ কার ভাগ্যে কি আছে! মাড়োয়ারী লোকটি শেষ পর্যন্ত সুফিয়াকে আংগুল দিয়ে দেখাল।

তারপর সে কি করুণ দৃশ্য!

ঐ মহিলা সুফিয়াকে জোরপূর্বক মাড়োয়ারী লোকটির হাতে তুলে দিল।

সুফিয়া যখন তার সঙ্গে ধস্তধস্তি শুরু করল তখন দু'জন বলিষ্ঠ লোক এসে সুফিয়াকে শক্ত দড়ি দিয়ে মজবুত করে বাঁধলো, ঠিক মনিরাকে যেমন করে একদিন বেঁধেছিল।

সুফিয়ার সে কি কান্না, মনিরার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কি করবে সে। নিজেও যে সে অসহায়!

সুফিয়াকে বেঁধে নিয়ে যাবার পর মনিরা বুঝতে পারল বেশি টাকা দিতে লোকটা অসমর্থ হওয়ায় সে আজ বেঁচে গেল। কারণ সুফিয়ার দাম তার চেয়ে কম ছিল।

ইতোমধ্যে আরও দু'জন মেয়েকেও চালান দেয়া হয়েছে। মনিরা নিজের ভাগ্যের কথা অহরহ চিন্তা করে। কি দুর্ভাগ্য তার! সে বন্ধ কক্ষে একটি ছোট আসন সংগ্রহ করে নিয়েছে, তাতেই বসে সে সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা এবং গভীর রাতে খোদার কাছে প্রার্থনা করে—হে দয়াময়, তুমি আমাকে বাঁচিয়ে নাও–আমার স্বামী, আমার পুত্র সব তুমি কেড়ে নিয়েছ তাতে দুঃখ নেই। আমাকে সর্বহারা করেছ তাতে আমি মর্মাহত নই, তুমি শুধু আমার ইজ্জত রক্ষা কর।

মনিরা বুদ্ধিমতী হয়েও আজ বুদ্ধিহীন। এখান থেকে পালাবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছিল, নানা রকম ফন্দি এঁটেছিল কিন্তু সব ব্যর্থ হয়েছে। এখন তাকে আর সেই পূর্বের কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়নি, অন্য একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মনিরার সেই কক্ষে এখন আরও কয়েকটি মেয়ে বন্দিনী রয়েছে।

মনিরা বুঝতে পেরেছে এই নরপিশাচী মহিলা শুধু বাঈজী নয়, সে এক নারী ব্যবসায়ীও। জঘন্য এই মহিলার আচরণ। অতি সাংঘাতিক সে! মনিরা লক্ষ্য করেছে, এই নরপিশাচীর নিকটে বহু দেশের লোকের আমদানি হয়। ভদ্র সাধু সেজে সবাই এখানে আসা-যাওয়া করে থাকে। বাইরের লোক কিছুই টের পায় না। এই বিরাট বপুধারিণী মহিলা হেমাঙ্গিনী শুধু নারী-ব্যবসাই করে না, শিশু-ব্যবসাও করে।

দূর দূর দেশ থেকে তার অনুচরগণ ভদ্রঘরের সন্তানদের চুরি করে এখানে পাঠিয়ে দেয়। এখান থেকে ওদের চালান করা হয় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এবং দেশ হতে দেশান্তরে।

মনিরা শিক্ষিতা যুবতী, সব বুঝে সে। কিন্তু কি করবে, কোন উপায় নেই নিজেদের রক্ষা করার।

শয়তানী হেমাঙ্গিনী শৃগালিনীর ন্যায় ধূর্ত, মনিরা একটু বেশি বুদ্ধিমতী তাই তাকে আরও কড়া পাহারায় রেখেছে। কোন সময় যেন সে অন্য কোন যুবতীর সঙ্গে কথা বলতে না পারে সেজন্য কঙ্কাল ধরনের মহিলাটিকে নিয়োজিত রেখেছে। কঙ্কালিনী মহিলা তার কোটরাগত জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে সব সময় তার দিকে তাকিয়ে থাকে। রাতে ঘুমিয়েও যেন শান্তি নেই মনিরার। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পায় মনিরা সেই কঙ্কালিনী মহিলা কক্ষের এক কোণে বসে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। ভাবে মনিরা সর্বনাশ, একি মানুষ না ভূত, কোন সময় ঘুম নেই তার চোখে!

দিনের পর দিন কেটে যায়, বদ্ধকক্ষে কঙ্কালিনীর দৃষ্টির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার উপক্রম হয় মনিরার।

ইতোমধ্যে আরও কয়েকজন লোক এসেছিল, তাকে দেখে পছন্দ করে দাম দর করেছিল, কিন্তু হেমাঙ্গিনী তার দর চরমে বাড়িয়ে দিয়েছে, কাজেই ইচ্ছা সত্ত্বেও কেউ মনিরাকে ক্রয় করতে সক্ষম হয়নি। মনিরা হাত তুলে খোদার নিকট প্রার্থনা করেছে–দয়াময়, তুমি এমনি করেই আমাকে বাঁচিয়ে নিও।

❑

এখানে মনিরা যখন খোদার নিকটে প্রার্থনা করে চলেছে, তখন বনহুর আর নূরী তাদের মনিকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে।

নূরী মনিকে নিয়ে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে আর গুন গুন করে গান গাইছে।

এমন সময় বনহুর পেছন থেকে এসে নূরীর চোখ দুটি টিপে ধরল।

নূরী দক্ষিণ হাতখানা দিয়ে বনহুরের হাত স্পর্শ করে বললো—হুর!

বনহুর নূরীর চোখ ছেড়ে দিয়ে এবার মনির গালে মৃদু চাপ দিয়ে বলল—কার কোলে বসে দোল খাচ্ছ মনি?

মনি শব্দ করল–মা ম্মা-ম্মা.....

বনহুর অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো, তারপর হাসি থামিয়ে বলল—শুনলে নূরী?

নূরী হৃদয়ে আনন্দ উপভোগ করলেও মুখখানা তার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। মনিকে বনহুরের কোলে তুলে দিয়ে বলল—নাও।

বনহুর হাত দু'খানা পেছনে রেখে মুখ নেড়ে বলল—উঁ হুঁ, ওকে আমি নেব না।

নিতেই হবে। নূরী মনিকে জোর করে দিতে গেল বনহুরের কোলে।

বনহুর পিছু হটতে শুরু করল।

কিন্তু নূরী নাছোড়বান্দা—নিতেই হবে আজ মনিকে।

অগত্যা বনহুর মনিকে কোলে নিয়ে আদর করছিল, নূরী তখন অবাক নয়নে তাকিয়েছিল উভয়ের মুখের দিকে—একি, হুর আর মনির মুখের মধ্যে অদ্ভুত মিল রয়েছে----এমন কেন হয়েছে? নূরী এটা অনেক দিন লক্ষ্য করেছে কিন্তু কিছু বলার সাহস হয়নি। এটা বলাও তার উচিত হবে না, কাজেই নিশ্চুপ থাকে নূরী।

বনহুর মনিকে আদর করছিল, এমন সময় রহমান এসে কুর্ণিশ জানিয়ে বলে—সর্দার; জরুরী খবর আছে।

বনহুর নূরীর কোলে মনিকে দিয়ে বলল—চল।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে গেল।

নূরী মনিকে নিয়ে দোলনায় শুইয়ে দিল।

❑

গোপন আলোচনাকক্ষে প্রবেশ করল বনহুর ও রহমান। বনহুর আসন গ্রহণ করে বলল—কি খবর রহমান?

সর্দার, আমাদের বিশ্বস্ত অনুচর কোরেশী একটা সন্ধান এনেছে। নারী হরণকারী এবং নারী ব্যবসায়ী একজন কুচক্রী নেতাকে সে আবিষ্কার করেছে। কোরেশীকে ডাকব?

হাঁ ডাক।

রহমান কলিংবেলে হাত রাখতেই এক বলিষ্ঠ লোক কক্ষে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানাল।

রহমান বলল–সর্দার, এর নামই কোরেশী।

বল তুমি কি সংবাদ সংগ্রহ করে এনছ?

বনহুর প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে তাকাল কোরেশীর দিকে।

কোরেশী ওর হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করে বলল—সর্দার, একটি কাফ্রি লোক সেই নারীহরণকারী।

বনহুর বললো–সে-ই যে নারীহরণকারী, এ কথা তোমাকে কে বলল?

সর্দার, আপনার নির্দেশ মতই আমরা শহরের বিভিন্ন স্থানে গোপনে ছড়িয়ে রয়েছি। কেউ হোটেলে, কেউ ক্লাবে, কেউ পথে-ঘাটে-মাঠে, এমন কি পুলিশ অফিসেও আমরা রয়েছি।

পুলিশ অফিসে ?

হ্যাঁ সর্দার, আমাদের একজন পুলিশ অফিসে ঝাড়ুদারের ছদ্মবেশে কাজ করে।

আর তুমি?

আমি পুলিশ অফিসারের বাংলোয় কাজ করি।

বনহুর সোজা হয়ে বসল—মিঃ জাফরীর ওখানে?

হ্যাঁ, আমি সেখানে বাবুর্চির কাজ করি সর্দার।

বেশ! সেখান থেকে তুমি কি করে নারীহরণকারীর সন্ধান পেলে? প্রশ্ন করল বনহুর।

আজ সেখানে ঐ লোকটা এসেছিল।

কোন লোকটা?

সেই কাফ্রি ভদ্রলোক।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল–সেই যে নারীহরণকারী এবং নারী ব্যবসায়ী, এ কথা কেমন করে জানলে?

সর্দার, লোকটা চলে যাবার পর পুলিশ অফিসারদের মধ্যে যে আলোচনা হলো আমি লুকিয়ে থেকে সব শুনেছি। ঐ লোকটাই নাকি এ দেশে কাঠের ব্যবসার নামে নারীহরণ ব্যবসা চালাচ্ছে। কিন্তু সর্দার, পুলিশ সন্দেহ করছে ঐ কাফ্রি নাকি আপনার দলের লোক।

বনহুর হেসে বলল—তুমিও যেমন সন্দেহ করেছ ঠিক তেমনি মিথ্যা সন্দেহ করে চলেছে পুলিশ অফিসারগণ। কাফ্রি ভদ্রলোক যেমন আমার কোন অনুচর বা দলের লোক নয়, তেমনি সে নারীহরণকারী নাও হতে পারে। তবু তোমরা সেই কাফ্রি ভদ্রলোকে লক্ষ্য রাখবে।

কোরেশী বলল–আচ্ছা সর্দার। কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

বনহুর এবার রহমানের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল–রহমান, তাজকে প্রস্তুত কর।

তাজের পিঠে বনহুর এবং অন্য একটি অশ্বপৃষ্ঠে রহমান। দু'জনের শরীরেই সাধারণ সওদাগরী ড্রেস। বনপ্রান্তর ছাড়িয়ে ওরা দু'জন শহরে এসে পৌঁছল। কেউ দেখলে ওদের চিনতে পারবে না এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ হয়েছিল ওদের।

শহরে পৌঁছার পূর্বেই তাজ এবং দ্বিতীয় অশ্বটি বনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বনহুর আর রহমান একটি ট্যাক্সি ডেকে চেপে বসল।

রহমান ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল—কাঠের ব্যবসায়ী হাবসী মিয়ার বাড়ি চলো।

হাবসী মিয়াকে শহরের প্রায় সব যানবাহন চালকই জানে, কাজেই ড্রাইভার অতি সহজেই তাদের নিয়ে উপস্থিত হলো তার বাড়িতে।

বাড়ির অনতিদূরে হাবসী মিয়ার বিরাট কাঠের কারখানা। আফ্রিকার বন থেকে হাবসী মিয়া নানা রকমের কাঠ এনে এ দেশে কারবার করে থাকেন।

বাড়ি বলতে তার এমন সুন্দর বাড়ি কিছু নয়। কাঠ-কাঠরা দিয়ে থাকার মত খানিকটা জায়গা করে নিয়েছেন হাবসী মিয়া— সেখানেই তিনি বাস করেন তাঁর কয়েকজন কর্মী নিয়ে। তাঁর বেশির ভাগ কর্মী কাফ্রি।

এদেশের কারবার জমিয়ে হাবসী মিয়া বেশ মোটা টাকা করে ফেলেছেন। কোটিপতি বলা চলে। কিন্তু লোকটাকে দেখলে তেমন টাকাওয়ালা বলে মনে হয় না। ঢিলা পাজামা আর পাঞ্জাবী পরেন। মাথায় একটা সাদা টুপি এবং পায়ে কুমীরের চামড়ার জুতা। অদ্ভুত চেহারা এই হাবসী মিয়ার।

টাকা পয়সা ছাড়া হাবসী মিয়া কিছুই বুঝেন না। কোন ফাংশন বা পার্টিতে তাকে কোনদিন দেখা যায়নি। লোকসমাজে কেউ তাঁকে দেখতে পায় না, লোকটা সদা কাজ আর কাজ নিয়েই থাকেন। এমন কি হাবসী মিয়া এত টাকা-পয়সাওয়ালা মানুষ হয়েও একটা চটের বিছানায় দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমান।

কোন লোকের সঙ্গেই তেমন তাঁর পরিচয় নেই। শহরের যার বিশেষ করে কাঠের প্রয়োজন তারই শুধু পরিচয় এই অদ্ভুত ভদ্র লোকটির সঙ্গে।

সওদাগর দু'জনকে দেখতে পেয়ে হাবসী মিয়া সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তার বসবার কাঠের ঘরখানায় নিয়ে বসালেন। মোটা পুরু শালকাঠের তক্তা দিয়ে ঘরখানা তৈরি। ঘরের খুঁটিগুলো মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি করা হয়েছে। মেঝেতে এবং আশেপাশে বিচ্ছিন্নভাবে এলোমেলো কাঠের টুকরা ছড়ানো।

বনহুর আর রহমান সওদাগরের বেশে হাবসী মিয়ার বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করল।

হাবসী মিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন— স্যার, আপনাদের কি ধরনের কাঠ বা তক্তার প্রয়োজন?

রহমান বলল— একটা বজরা তৈরির অর্ডার দেব।

হাবসী মিয়া খুশি হলেন— বজরা! আপনারা যে ধরনের বজরার অর্ডার দেবেন আমরা অতি অল্প সময়ে মজবুত করে তৈরি করে দিতে পারব।

এবার বনহুর বলল— আপনার কাছে রুচিমত জিনিস পাব বলেই আমরা অনেক দূরে থেকে এসেছি।

নিশ্চয়ই পাবেন, অবশ্যই পাবেন। আমার কাছে কয়েকটা বজরার ক্যাটালগ আছে, চলুন দেখবেন।

চলুন। বনহুর উঠে দাঁড়াল।

রহমানও বনহুরকে অনুসরণ করল।

হাবসী মিয়া বনহুর এবং রহমানকে তার বজরার ক্যাটালগগুলো দেখালেন।

বনহুর ক্যাটালগে একটা বজরা দেখিয়ে সেই মত একটি বজরা তৈরি করার জন্য অর্ডার দিল।

হাবসী মিয়া খুশিতে আত্মহারা হলেন। যদিও তিনি দৈনিক বহু কাজের এবং কাঠ ও তক্তার অর্ডার পেয়ে থাকেন তবু এমন একটা অর্ডার পাওয়া কম কথা নয়! অনেকগুলো টাকা পেয়ে তার আনন্দের সীমা রইল না।

সওদাগরবেশি বনহুর এবং রহমান এক সময় বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

ঠিক সেই সময় একটা জীপগাড়ি এসে হাবসী মিয়ার কারখানার সামনে থামল

বনহুর লক্ষ্য করলো দু'জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক জিপগাড়ি থেকে নেমে কারখানায় প্রবেশ করলেন। একজনের চোখে কাল চশমা এবং মুখে দাড়ি রয়েছে। অন্যজনের মুখেও একমুখ পাকা দাড়ি আর গোঁফ। বনহুর আর রহমান আরও অক্ষ্য করল, হাবসী মিয়া এদের দু'জনকেও সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

বনহুর এবার ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়বার আদেশ দিল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে বলল বনহুর— রহমান, যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক দু'টি এই মুহূর্তে জীপ থেকে নেমে হাবসী মিয়ার কারখানায় প্রবেশ করল তাদের চিনতে পেরেছ?

না সর্দার, ওদের চিনতে পারলাম না।

আমাদের অতি পরিচিত লোক ওরা।

কিন্তু আমি কোথাও ওদের দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না তো?

নিখুঁত ছদ্মবেশ রয়েছে ওঁদের। কিন্তু আমার চোখে ধুলো দেয়া ওদের কাজ না। তাঁদের একজন পুলিশ অফিসার মিঃ হারুন, অন্যজন শঙ্কর রাও, পুলিশ ডিটেকটিভ।

সর্দার, ওরা কেন?

আমরা যে কারণে হাবসী মিয়ার ওখানে গিয়েছিলাম ওরাও ঠিক সে কারণে বুঝেছ?

হাবসী মিয়াকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হলো সর্দার?

খুব ভাল লোক।

তাহলে সে এ নারীহরণ ব্যাপারে জড়িত নয়?

না, হাবসী মিয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ। নারীহরণ বা ছেলেমেয়ে চুরি এর কোনটাই সে করে না।

সর্দার, তাহলে অতগুলো টাকা---

নষ্ট হলো, এই তো?

হ্যাঁ সর্দার, অযথা বজরার বায়না বাবদ এতগুলো টাকা না দিলেও চলতো না কি?

চলতো কিন্তু এতদূর তলিয়ে তাকে বুঝতে পারতাম না। তাছাড়া বজরার তো প্রয়োজনই রয়েছে একটা নিয়ে নেয়া যাবে।

রহমান কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল— পুলিশের লোকও তাহলে হাবসী মিয়াকে সন্দেহ করেছে?

হ্যাঁ, রহমান তারা শুধু হাবসী মিয়াকে নারীহরণকারী বলেই সন্দেহ করেছে।

কথাগুলো বেশ নীচুস্বরে হচ্ছিল, যাতে ড্রাইভার শুনতে না পায়।

বনহুর আর রহমান যখন গাড়ি ত্যাগ করলো তখন তারা ড্রাইভারকে অনেকগুলো টাকা বখশিস দিল।

ড্রাইভার অবাক কণ্ঠে বলল— স্যার, এত টাকা দিচ্ছেন কেন?

রহমান হেসে বলল— তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছিলাম।

ড্রাইভার বলল—আপনারা কে? নিশ্চয়ই কোন মহান ব্যক্তি আপনারা?

এবার বনহুর কথা বলল— ঠিক তার উল্টা—দস্যু বনহুর!

ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলল ড্রাইভার— দস্যু বনহুর।

হাঁ, যাও।

ড্রাইভার জানে, দস্যু বনহুর লোকের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নেয়, সে আবার টাকা দেয়, এত দয়ালু দস্যু বনহুর।

ড্রাইভার একবার হাতের টাকাগুলো, একবার দস্যু বনহুরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

বনহুর আর রহমান একটু হেসে তাদের গন্তব্যপথে পা বাড়াল।

বনহুর আর রহমান দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হতেই ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। একটা আলোড়ন শুরু হয়েছে ড্রাইভারের বুকের মধ্যে। দস্যু বনহুরকে সে স্বচক্ষে দেখেছে, তার গাড়িতেই দস্যু বনহুর চেপেছিল, এর চেয়ে আশ্চর্যের কথা আর কি আছে? কোথায় কাকে বলবে, কার কাছে বললে সে তৃপ্তি পাবে ভাবতে লাগল। মনে পড়ল কিছুদিন পূর্বের সেই সরকারি ঘোষণার কথা— দস্যু বনহুরকে যে মৃত বা জীবিত পাকড়াও করে আনতে পারবে তাকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

ড্রাইভারের দু'চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, তখনই গাড়ি নিয়ে ছুটলো পুলিশ অফিসের দিকে।

সে পুলিশ অফিসে গিয়ে বলল— হুজুর, একটা খবর আছে, দস্যু বনহুরকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং আমার গাড়িতে সে চেপেছিল।

ড্রাইভারের কথা শুনে পুলিশের লোকের সন্দেহ হলো। নিশ্চয়ই এ দস্যু বনহুরের দলের কোন লোক। পুলিশ ওকে গ্রেফতার করে ফেলল এবং তল্লাশি করে অনেক টাকা উদ্ধার করল ওর জামার পকেট থেকে।

হাজতে বন্দী হয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল ড্রাইভার। হায়, কেন সে ভাল মনে করে পুলিশ অফিসে কথাটা জানাতে গিয়েছিল, শেষে কিনা টাকাগুলোও গেল, হাজতেও আসতে হলো।

এবার ড্রাইভার বুঝতে পারল কেউ উপকার করলে তার অপকারের চেষ্টা করা মহাপাপ। ডুকরে কাঁদতে লাগল সে।

❑

দাড়ি-গোঁফভরা মুখ, মাথায় এক রাশ এলোমেলো জটধরা চুল। চোখ দুটো কোটরাগত। দেহ কঙ্কালসার। পৃথিবীর বুকে এসে দাঁড়াল কায়েস। প্রাণভরে নিশ্বাস নিল। কতদিন পর সে দুনিয়ার আলো বাতাস গ্রহণ করল।

টলতে টলতে পথ চলছে।

পাশ কেটে চলে যাচ্ছে কত যানবাহন, কত লোকজন।

কেউ তাকাচ্ছে, কেউ তাকাচ্ছে না। কেউ বা পাগল ভেবে ঢিল ছুড়ে মারছে। শরীরে কাপড় নেই বললেই চলে— এক টুকরা ময়লা ন্যাকড়া নেংটির মত করে পরা রয়েছে। একদিন এই কায়েস যে একজন মস্ত বলিষ্ঠ পুরুষ ছিল, তার শরীরে ছিল অসীম বল, আজ তাকে দেখলে কেউ তা বিশ্বাসই করবে না।

কায়েস ঝিন্দ শহরের পথ ধরে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। ক্ষুধা পিপাসায় অত্যন্ত কাতর সে, এতটুকু খাদ্য আর পানির নিতান্ত দরকার তার। একটা কলতলায় এসে দাঁড়াল।

কতগুলো নারীপুরুষ কলসী এবং মশকে করে পানি ভরছে। কায়েস কতদিন পরিষ্কার পানি পান করেনি। লোলুপ দৃষ্টিতে পানির দিকে তাকিয়ে রইলো। এক তরুণী বলল— এই পাগলা, পানি খাবি?

কায়েসের গলা দিয়ে কথা বের হলো না, মাথা দোলাল সে— খাবে।

তরুণী একটা মাটির পাত্রে কিছুটা পানি এনে কায়েসের সামনে রাখল, বলল— খা।

কায়েস এক নিঃশ্বাসে পানিটুকু পান করে এটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। এতক্ষণে যেন কায়েস পুর্নজন্ম লাভ করল। আবার পথ চলতে শুরু করল সে।

কায়েস চলছে আর ভাবছে এখন কোথায় যাবে, কি করবে। ঝিন্দ শহরে সে তেমন করে কারও সঙ্গে পরিচিত নয়, আর যা একটু পরিচয় কারও কারও সঙ্গে ছিল তারাও চলে গেছে এত দিনে নিশ্চয়ই। নতুন করে পরিচয় দিলে এ অবস্থায় তাকে কেউ চিনতেই পারবে না। আজ আবার নতুন করে মনে পড়তে লাগল সর্দারের কথা। দু'চোখ ছাপিয়ে পানি এলো। সর্দারকে তারা প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। মনে পড়লো সর্দারপত্নী মনিরার কথা, তাকে খুঁজতেই তো বেরিয়ে ছিল সে, তারপর এই অবস্থা। তিনি এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কে জানে। তাঁর গর্ভে ছিল সর্দারের সন্তান। একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন দোলা দিয়ে গেল কায়েসের মনে। মুহূর্তের জন্য কায়েস ভুলে গেল তার ক্ষুধাকাতর অবস্থার কথা। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল খুশিতে। নিশ্চয়ই মনিবপত্নীর সন্তান জন্মেছে। তিনি যেখানেই থাকুন, সন্তান প্রসব করেছেন তা ঠিক। কিন্তু মেয়ে না ছেলে জন্মেছে কে জানে। কায়েস নিজ মনেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল ওরা যেখানেই থাক আমি খুঁজে বের করবই। আবার চলতে লাগল কায়েস।

পথে পথে ঘুরে ঘুরে দিন কাটতে লাগল কায়েসের। দয়া করে কেউ দু'একটা পয়সা ছুড়ে দেয় তার দিকে, তাই দিয়ে কিছু কিনে খায় সে। ফুটপাথের ধারে রাত কাটে আর, দিনের বেলায় কাটে পথে পথে। এমনিভাবে দিন যায়, সপ্তাহ আসে, সপ্তাহ গিয়ে মাস হয়ে এলো। হতাশায় আর ক্লান্তিতে ভরে উঠল কায়েসের মন। কই, এতদিনেও তো তার মনিবপত্নী মনিরা ও তার সন্তানের সন্ধান পেল না। তবে কি তারা বেঁচে নেই?

যেখানেই কোন যুবতী বা নারী দেখতো কায়েস সেখানে গিয়েই দাঁড়াত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকত লক্ষ্য করত তার সর্দারের পত্নীর মত দেখতে কিনা।

এমনি লুকিয়ে লুকিয়ে যুবতীদের দেখতে গিয়ে বহুদিন কায়েসকে হতে হয়েছে লাঞ্ছিত, অপমানিত, শয়তান-বদমাস নামে অপবাদ নিতে হয়েছে তাকে। তবু দুঃখ নেই তার এতটুকু, মনের যত ব্যথা কষ্ট মুছে ফেলে সে আবার ছুটে যেত কোন যুবতী বা মহিলা দেখলেই। হয়তো দু'চার ঘা-চড়-থাপ্পড় খেতে হতো তাকে।

কায়েস যখন মনিবপত্নী এবং তার সন্তানের সন্ধানে ঝিন্দ শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন সেই মনিবপত্নী এক নারী ব্যবসায়ীর চোরাকক্ষে বন্দিনী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। আর তার সন্তান দিন দিন শশীকলার মতই বেড়ে উঠছে নূরীর কোলে।

❑

আজকাল আবার বনহুর তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। কাজ আর কাজ নিয়ে মেতে উঠেছে। শহরে আবার দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য। শুধু একটি শহর বা কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই বনহুর তার দস্যুবৃত্তি সীমাবদ্ধ রাখল না, সব জায়গায়ই চলল তার অভিযান। আবার সে মেতে উঠল নব উদ্যমে।

নগরবাসীর মনে আবার ত্রাহি ত্রাহি ভাব জাগল। পুলিশমহল ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। পুলিশদের কড়া পাহারা সত্ত্বেও এখানে সেখানে চললো লুটতরাজ।

শহরের সবচেয়ে বড় ব্যাংকে হানা দিয়ে দস্যু বনহুর এক লাখ টাকা নিয়ে উধাও হল। পরদিনই পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের বাড়িতে হানা দিয়ে বহু অলঙ্কার ও নগদ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে যায় বনহুর। এবার সে পূর্বের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

মিঃ আহমদের বাড়িতে ডাকাতি হওয়ায়, পুলিশমহল পর্যন্ত ঘাবড়ে যায়। নানাভাবে, নানা কৌশলে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য তৎপর হয় সবাই।

শহরের এবং গ্রামাঞ্চলের বিশিষ্ট লোকজন সবাই নিজেদের রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

দরজায় বন্দুকধারী পাহারাদার। বাড়ির আশেপাশে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেও কেউ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছে না। বিছানায় শুয়ে সদা ভয়কম্পিত হৃদয়ে সময় কাটায়—কবে কখন না জানি দস্যু বনহুর এসে হাজির হবে।

সকলের মনেই দস্যু বনহুরের নামে আতঙ্ক। নারীহরণ, শিশুহরণ, অর্থহরণ সবই নাকি দস্যু বনহুরের কাজ।

বনহুর অজস্র টাকা লুট করে আবার তার ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলল। আবার সে ইচ্ছামত অর্থ ছড়িয়ে দিতে লাগল দীনহীন জনগণের মধ্যে। ইচ্ছমত নষ্টও করতে লাগল সে ঐ সব লুটতরাজের মালামাল।

নূরী অবাক হয়ে বলল, একদিন সে— হুর, তুমি আবার এমন ভাবে ক্ষেপে উঠলে কেন? আমার কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল বনহুর— কিসের আশঙ্কা নূরী?

সাতবার জয়ী হয়ে একবার যদি পরাজিত হও!

বনহুর নূরীর গালে মৃদু টোকা দিয়ে বলল— তোমার মনে এ দুর্বলতা শোভা পায় না নূরী। তুমি কি চাও, আমি পরাজিত হই?

ছিঃ এ কথা তুমি বলতে পারলে হুর! তোমার পরাজয় আমি কামনা করতে পারি! অভিমানে ভরে উঠল নূরীর মুখ।

বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলল— নূরী, তুমি রাগ কর না, আমি যে তাহলে দিশেহারা হয়ে পড়ব।

কিন্তু তুমি কেন আবার এভাবে নিজেকে মাতিয়ে তুললে হুর? বেশ তো শান্ত হয়ে এসেছিলে?

বনহুর নূরীকে ছেড়ে দিয়ে বলল—নূরী, তুমি কি চাও, আমি নির্জীবের মত নীরব হয়ে পড়ি?

না, তা চাই না, কিন্তু----

হেসে উঠল বনহুর—নূরী, সিংহশাবক কোনদিন চুপ থাকতে পারে না। রক্তের পিপাসা তাকে চুপ থাকতে দেয় না—

তুমি কি উম্মাদ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নূরী যা বলো তাই।

এত অর্থ তুমি কি করবে হুর?

অর্থ? যে প্রশ্ন তুমি করেছ নূরী তা অতি সত্য। কিন্তু জানতো, অর্থ আমি নিজের জন্য জমা রাখি না। আমার লাখ লাখ অসহায় দীনহীন অভাগা ভাইবোনদের মাঝে বিলিয়ে দেই।

জানি হুর, সব জানি, তবু প্রশ্ন করি।

না নূরী, এ প্রশ্ন তুমি আর আমাকে কর না।

কায়েস অনেক সন্ধান করেও যখন মনিরা ও তার সন্তানের কোন খোঁজ পেল না তখন হতাশায় তার মন ভেঙ্গে পড়ল। এভাবে পথে পথে ঘুরে আর তার কোন লাভ হবে না। মনে পড়লো রহমানের কথা, মনে পড়লো অন্যান্য সঙ্গীর কথা। তার কান্দাই বনের আস্তানায় ফিরে যাওয়া উচিত। সেখানে রহমান আছে, আরও দলবল আছে। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আবার সে ঝিন্দ শহরে আসবে। ঝিন্দেব প্রতিটি বাড়ি সে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তার সর্দারপত্নী মনিরাকে? যদি তারা বেঁচে থাকে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন খুঁজে বের করবই।

কায়েস এবার ফিরে চলল কান্দাই আস্তানায়।

পয়সা ছিল না তার, ভিখারীর বেশে একদিন কান্দাই এসে পৌছল।

অতি কষ্টে একদিন সে নিজেদের আস্তানায় আসতেও সক্ষম হল। কিন্তু তার চেহারা এমনভাবে বদলে গেছে যে, তাকে দেখে তার অতি আপনজনও চিনতে পারবে না।

কায়েস যখন তাদের আস্তানায় প্রবেশের চেষ্টা করেছিল তখন তাকে বনহুরের কয়েকজন অনুচর পাকড়াও করে ফেলল।

গুপ্তচর ভেবে তাকে ওরা মজবুত করে বেঁধে নিয়ে এলো বনহুরের দরবারে।

বনহুর তখন সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট। সামনে দণ্ডায়মান তার অনুচরগণ। দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে তারা। নতুন কোন জায়গায় হানা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল দস্যু বনহুর।

রহমান তার দক্ষিণ পাশে দণ্ডায়মান।

প্রত্যেকটা অনুচরের হাতে সুতীক্ষ্ণধার বর্শা, বল্লম ও রাইফেল।

এমন সময় দরবারকক্ষে প্রবেশ করল বনহুরের দু'জন অনুচর। কুর্ণিশ জানিয়ে বলল—সর্দার একজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল—গুপ্তচর?

হ্যাঁ সর্দার। লোকটা আমাদের আস্তানায় প্রবেশের চেষ্টা করছিল।

রহমান বলে উঠল—এত সাহস তার!

বনহুর বলল— গুপ্তচর মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না রহমান। প্রাণ দিয়ে ওর সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে।

রহমান বলে উঠল—নিশ্চয়ই পুলিশের গুপ্তচর হবে।

বনহুর বলল—নিয়ে এস তাকে।

অনুচরদ্বয় চলে গেল, একটু পরে জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার কায়েসকে পিছমোড়া করে বেঁধে দরবারকক্ষে নিয়ে এলো।

কায়েস দরবারকক্ষে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ে অস্ফুটধ্বনি করে উঠল-সর্দার! দু'চোখে আনন্দের দ্যুতি খেলে গেল ভুলে গেল তার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। ছুটে এগিয়ে যেতে গেল সে, অমনি ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। কায়েস বুক দিয়ে এগুতে লাগল। তার সর্দার জীবিত রয়েছে, এ যে সে কল্পনাও করতে পারেনি। আনন্দে বুক তার স্ফীত হয়ে উঠছে।

কায়েসের অদ্ভুত আচরণে বনহুর এবং তার অনুচরগণ আশ্চর্য হলো। রহমান বলল— একি ব্যাপার সর্দার?

কায়েস তখনও বনহুরের আসনের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে।

বনহুর তার একজন অনুচরকে আদেশ করল ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করা হলো।

কায়েস বন্ধনমুক্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু তার দৃষ্টি সর্বক্ষণ বনহুরের দিকে রয়েছে। কায়েস যেন হারানো ধন ফিরে পেয়েছে। লম্বা চুল, দাঁড়ি-গোফে ভরা মুখখানা তার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রহমান বলল— সর্দার, লোকটাকে পাগল বলে মনে হচ্ছে।

কায়েস ততক্ষণে বনহুরের আসনের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

দু'জন অনুচর ওকে ধরে ফেলল— এখানে দাঁড়াও।

কায়েস ক্ষীণকণ্ঠে বলল— না, আমাকে সর্দারের কাছে যেতে দাও। ছেড়ে দাও তোমরা আমাকে, যেতে দাও।

বনহুর এবার বলল—আসতে দাও ওকে।

এবার আর কেউ তাকে বাধা দিল না, সে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলো বনহুরের আসনের সম্মুখে।

রহমানের মুখমণ্ডল রাগে গম্ভীর হয়ে উঠেছে, নিশ্চয়ই লোকটা কোন অভিসন্ধি নিয়ে এসেছে। তাদের সর্দারকে হত্যা করে নিজে মৃত্যুবরণ করতেও ভীত নয়। রহমান নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কায়েস বনহুরের নিকটবর্তী হয়ে পুনরায় আনন্দভরা গলায় বলে উঠল— সর্দার, আপনি জীবিত।

বনহুর বলল— কে তুমি?

কায়েস ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল— আমাকে চিনতে পারছেন না সর্দার? আমি ---আমি কায়েস--

তুমি কায়েস! সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো। মনিরার নিরুদ্দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কায়েসের। তার চক্রান্তেই হয়তো মনিরা বিপথে গিয়েছিল। তাই বনহুর ভুলেও কোনোদিন কায়েসের নাম মুখে আনেনি। রাগে ক্ষোভে অভিমানে বনহুর দগ্ধীভূত হয়েছে তবু কোনদিন মনিরা বা কায়েসের সন্ধান নেয়নি।

রহমান যদি কোনদিন বলেছে মনিরা বা কায়েসের সম্বন্ধে কোন কথা, তাহলে বনহুর ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে। কোন অনুচর ভয়ে কোনদিন কায়েসের নাম মুখে আনার সাহস পায়নি, আজ সেই কায়েস স্বয়ং দস্যু বনহুরের সামনে হাজির!

বনহুর গর্জন করে উঠল— বদমাশ কোথা থেকে এলি তুই! জানিস তোর জন্য মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয়া রয়েছে?

কায়েসের মুখমণ্ডল বিষণ্ন হলো, ব্যথাকাতর কণ্ঠে বলল— সর্দার, আমার অপরাধ?

বনহুর আসন থেকে উঠে দাঁড়াল, তারপর বলল— রহমান, ওকে আমার বিশ্রামকক্ষে হাজির করো। কথা শেষ করে বেরিয়ে গেল বনহুর।

দরবারকক্ষে একবার সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল। রহমান বলল— একে আমার সঙ্গে নিয়ে এসো।

দু'জন অনুচর পুনরায় কায়েসের হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে চলল।

রহমান বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করে দেখল বনহুর ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করে চলেছে।

কায়েস এবং দু'জন অনুচরসহ রহমান প্রবেশ করতেই বনহুর থমকে দাঁড়াল।

রহমান অনুচরদ্বয়কে বেরিয়ে যাবার জন্য ইংগিত করল।

কায়েস এবং রহমান দাঁড়িয়ে রইলো শুধু। কায়েসের চোখে মুখে এখনও আনন্দের ছাপ, যদিও তার হাত দু'খানা পুনরায় কঠিন ভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বলল— জান তোমাকে এখনই হত্যা করা হবে?

আমি কি অপরাধ করেছি মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে তা জানতে চাই। তারও পূর্বে আর একটি কথা আমাকে বলুন, আমাদের বৌ-রাণী কোথায়, তার সন্তান কোথায়?

প্রচন্ড আক্রোশে হুঙ্কার ছাড়ে বনহুর—চুপ কর বদমাশ। ও নাম আর আমার সামনে উচ্চারণ করিস না। পাপিষ্ঠা --রাগে ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে বনহুর। দু'চোখে যেন আগুন ঝরে পড়ে।

রহমান নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো, বনহুরের দিকে তাকাবার সাহস হলো না তার।

কায়েস যখন বলে উঠছিল— বৌরাণী কোথায়, তার সন্তান কোথায়, তখন বিস্ময়ভরা চোখে রহমান তাকিয়ে দেখছিল একবার কায়েসের মুখে, একবার বনহুরের মুখে। বৌরাণী হারিয়ে গেছে, কার সঙ্গে গেছে, কোথায় গেছে এসবের কিছুই জানে না সে। তার আবার সন্তান--- এসব কি শুনছে রহমান! এতদিনে রহমান বুঝতে পারলো, তার সর্দারের মনের মধ্যে একটা গভীর বেদনা নীরবে লুকিয়ে আছে, যা আর কেউ জানে না। এবার বুঝতে পারলো সে আর একমাত্র জানে কায়েস। রহমান নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো। মনের মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন উঁকি দিয়ে যাচ্ছে---- তবে কি তাদের প্রিয় বৌরাণী------ঐ রকম কিছু ঘটেছে যা সর্দার আজও কারও কাছে প্রকাশ করেনি বা করতে পারেনি। এমন কি তাকেও কোনদিন এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেনি।

রহমান পুনরায় তাকাল কায়েসের দিকে।

কায়েস তখনও উৎফুল্ল মুখে বনহুরের দিকে তাকিয়ে আছে।

বনহুর অধর দংশন করে বলল— শয়তান, বল— মনিরা কি করে ঐ পাপিষ্ঠ মুরাদের হাতে গিয়ে পড়ল।

অবাক হয়ে তাকাল কায়েস, বলল— বৌরাণী তবে নরাধম মুরাদের কবলে পড়েছিল? আপনি ঠিক জানেন সর্দার?

কেন, তুই জানিস না! নেকামি করছিস?

না সর্দার, আমি শপথ করে বলছি বৌরাণী কোথায় গেছে, কে তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, এসবের কিছু জানি না।

আমার কাছে মিথ্যা কথা! জানিস মিথ্যা কথার শাস্তি কি?

জানি সর্দার—আমি যা বলছি তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। সর্দার, আজ আমার এ অবস্থা কেন? আজ আমি মৃত্যুপথের যাত্রী--শুধু বৌরাণীর জন্যই আজ আমার এ অবস্থা--তার সন্ধানে গিয়েই আমি বন্দী হয়েছিলাম--

বনহুর এতক্ষণে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল কায়েসের মুখে, একটা ব্যাকুল আগ্রহ ফুটে উঠল তার চোখে।

কায়েস বলে চলেছে। বনহুর নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে সব কথা একটি পর একটি বলছে— সর্দার, আপনাকে নদীবক্ষে ত্যাগ করে যখন আমরা ফিরে গেলাম তখন বৌরাণীকে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া যায় না, আত্মবিসর্জন দেবেন সিন্ধি নদী বক্ষে। অতি কষ্টে নানা উপায়ে তাকে এক রকম বন্দিনী অবস্থায় নিতে হলো। কিন্তু ঝিন্দ শহরে পৌছে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ল। সর্দার কি বলবো, আপনার শোকে তিনি পাগলিনী প্রায় হয়ে পড়লেন। আহার নিদ্রা কিছুই ছিল না তার। অহরহ শুধু নীরবে বসে কাঁদতেন। এক সময় তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সব সময় মাথাধরা গা বমি বমি করত—কিছু খেলে অমনি বমি করতেন। আমি তাঁর এমন অবস্থা দেখে চিন্তিত হলাম--

বনহুর গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে কায়েসের মুখের দিকে। তার দু'চোখে ফুটে উঠেছে রাজ্যের আকুলতা।

রহমানের অবস্থাও তাই, নিশ্চুপ হয়ে শুনছে সে ওর কথা। কায়েস বলে চলেছে ----ডাক্তার ডাকলাম, ডাক্তার বৌরাণীকে পরীক্ষা করে বলল—- বৌরাণীর গর্ভে সন্তান আছে। সর্দার সেকি আনন্দ। ভুলে গেলাম আপনাকে হারানোর ব্যথা। বৌরাণীর গর্ভে আমাদের সর্দারের সন্তান—এ যে কত খুশির কথা -- বলতে বলতে কায়েসের চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বলেই চলেছে কায়েস— এরপর থেকে আমি বৌরাণীকে সব সময় ভালভাবে দেখাশোনা করতে লাগলাম। প্রতীক্ষা করতে লাগলাম সেই নতুন অতিথির যে আমাদের বৌরাণীর গর্ভে বিরাজ করছে— কিন্তু সে আশা

আমার সফল হলো না সর্দার— আমি ক'দিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম কিন্তু ফিরে এসে দেখি সব শূন্য—বৌরাণী নেই। বাড়ির কেউ তার সন্ধান দিতে পারল না। কিছুদিন পূর্বের একটি ঘটনার জন্য আমার মনে আশংকা হলো। একদিন একটি সিনেমা হলে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৌরাণীকে দেখে মেয়ে বলে আঁকড়ে ধরল এবং এমন সব কথাবার্তা বলতে লাগল যা আমার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। সর্দার, বৌরাণীকে আমি জোর করে সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম দিনরাত বসে বসে কাঁদাকাটা করেন বাইরে বেরুলে মনটা একটু ভাল হবে। আমার মনে হয়, সেই বৃদ্ধবেশি কোন শয়তান তাকে নিজের ব্যবহার দ্বারা মুগ্ধ করে--

এতক্ষণে বনহুর কথা বলল— হ্যাঁ সে বৃদ্ধ অন্য কেউ নয়, নরাধম পাষণ্ড শয়তান মুরাদ।

সর্দার, বৌরাণী তবে মুরাদের হাতে বন্দী?

এক সময় ছিল আজ আর নেই। আমি মুরাদকে হত্যা করেছি—

বৌরাণী—বৌরাণী কোথায় তবে সর্দার?

বনহুর দৃষ্টি নত করে নিল, তারপর ব্যথিত কণ্ঠে বলল—জানি না।

কায়েস আর্তনাদ করে উঠল— বৌরাণী এবং তার সন্তান—কারও কথাই আপনি জানেন না সর্দার?

না কায়েস, জানি না তারা এখন কোথায়।

সর্দার, বৌরাণীর কি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করল কায়েস।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল— তাও জানি না।

এবার রহমান বলে উঠল— সে কি সর্দার, বৌরাণীর কি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তাও জানেন না? তার সঙ্গে নাকি আপনার সাক্ষাৎ ঘটেছিল?

হ্যাঁ ঘটেছিল, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। আমি দূর থেকে শুধু তার সন্তানকে দেখেছিলাম।

কায়েস অস্ফুট শব্দ করে উঠলো— নিজের সন্তানকে আপনি দেখেও দেখেননি!

কায়েস, আমি তাকে ভুল বুঝেছিলাম। শয়তান মুরাদ মরার সময় আমার মনে বিষবাণ নিক্ষেপ করে গিয়েছিল, তাই আমি মনিরাকে ভুল

বুঝেছিলাম কায়েস, তাকে ভুল বুঝেছিলাম------বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বনহুরের কণ্ঠ।

রহমান এবং কায়েস বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। বনহুরের চোখে মুখে একটা অসহ্য বেদনার ছাপ ফুটে উঠল। দক্ষিণ বাহু দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল বনহুর।

এতদিনে রহমানের কাছে সর্দারের মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। কেন সর্দার ফিরে আসার পর এমন মৌন হয়ে পড়েছিল। সব সময় গভীরভাবে কি চিন্তা করত, হঠাৎ আবার কেনই বা এমন ভীষণভাবে ক্ষেপে উঠেছে। পূর্বের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে সর্দার এখন— সব আজ পরিষ্কার হয়ে যায় রহমানের কাছে। শান্তকণ্ঠে বলল রহমান—সর্দার, বৌ রাণী এখন কোথায় আছে বলতে পারেন?

বনহুর চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিল। ব্যথাকরুণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো রহমানের মুখে, বলল—জানি না। তবে যতদূর সম্ভব সে এখনও ঝিন্দ শহরেই আছে।

কোথায় আছে, কেমন আছে তাও জানেন না? কায়েস প্রায় কেঁদে ফেলল।

রহমান বলল— সর্দার, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, আজই আমরা ঝিন্দ শহর অভিমুখে রওয়ানা দেব। না জানি বৌরাণী কোথায় আছেন, কেমন আছেন। বিশেষ করে তিনি মেয়েলোক। কোলে তাঁর কচি সন্তান।

হ্যাঁ রহমান, তাই কর, তাই কর-- কিন্তু সে বেঁচে আছে কিনা কে জানে!

❑

বনহুর নিজের কক্ষে বসে গভীরভাবে মনিরার কথা চিন্তা করছিল। কি অন্যায় সে করেছে মনিরার ওপর! তাকে পেয়েও হারিয়েছে, একটা মিথ্যা সন্দেহে তার প্রতি কি নির্মম আচরণ করেছে। কি অন্যায়ই না সে করেছে। মনিরা তার এ কঠিন ব্যবহার কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না-----

অভিমানিনী মনিরা হয়তো আত্মহত্যা করেছে। না না, তা পারবে না—কোলে যে কচি শিশু— তার স্বামীর সন্তান। মিথ্যা কলঙ্কের ভয়ে এত বড় সত্যকে সে নষ্ট করতে পারে না। কিন্তু ঝিন্দ শহর তার একেবারেই অপরিচিত ,কেউ তাকে চেনে না, জানে না। সেও কাউকে জানে না, শোনে না; কোন জায়গা চেনে না। এখন ঝিন্দ শহরে কোথায় তাকে খুঁজবে, কোথায় পাবে—

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়, কক্ষে প্রবেশ করল নূরী, কোলে তার মনি।

নূরী বনহুরকে লক্ষ্য করে বলল—দেখ হুর, মনি কেমন হাসছে।

বনহুর অন্যমনস্কভাবে তাকালো মনির দিকে, তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আর একটি কচি মুখ। আনমনা হয়ে গেল বনহুর।

নূরী অভিমানভরা কণ্ঠে বলল—কি হলো আজ আবার তোমার?

ভ্রুকুঞ্চিত করে একটু হাসল বনহুর— কেন?

মনে হচ্ছে কিছু যেন হয়েছে।

তুমি দেখছি গণনা জান।

সত্যি হয়েছে কিনা বল?

হয়েছে, আমাকে আজই ঝিন্দে যেতে হবে।

সিন্ধি নদীর ওপারে?

হ্যাঁ, নূরী, সিন্ধি নদীর ওপারে— যাক, চলো একটু গল্প করা যাক।

মনিকে আজ তুমি আদর করছ না কেন?

মনির গালে মৃদু টোকা দিয়ে বলল বনহুর— এই তো করছি।

আবার বনহুর আর নূরী মেতে উঠল মনিকে নিয়ে।

❑

ঝিন্দ শহরে যাবার জন্য নূরী বনহুরকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিল। একজন ভীল সর্দারের বেশে সজ্জিত হলো বনহুর।

রহমানও বনহুরের মতই ভীলের সাজে সজ্জিত হলো। স্থলপথেই বনহুর এবং রহমান ঝিন্দ রওয়ানা দিল। অবশ্য একখানা বজরা জলপথে চলল তাদের জিনিসপত্র ও অন্যান্য অনুচর নিয়ে।

ভীল সর্দারের বেশে সজ্জিত হয়ে তাজের পাশে গিয়ে দাঁড়াল বনহুর আর রহমান।

নূরী এসে দাঁড়াল তার পাশে, কোলে মনি।

আজ হঠাৎ কেন যেন বনহুরের দৃষ্টি মনির মুখে পড়তেই হৃদয়ে একটা আলোড়ন অনুভব করলো, তাজের পিঠে চাপতে গিয়ে ফিরে এসে মনিকে তুলে নিল কোলে। একটু আদর করে পুনরায় নূরীর কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বললো— খোদা হাফেজ!

বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসল।

রহমান চেপে বলল তার দুলকির পিঠে।

নূরী নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো বনহুরের দিকে। বনহুরের অশ্ব তাজ ও রহমানের অশ্ব দুলকি তখন ছুটতে শুরু করেছে।

হঠাৎ মনি শব্দ করে উঠল— বা ব্বা ব্বা-----

নূরী চমকে উঠল, মৃদু চাপাকণ্ঠে বলল— কই, তোমার বাব্বা মনি? চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল মনির গাল দুটো।

বনহুর আর রহমানের অশ্ব তখন অদৃশ্য হয়েছে।

গহন বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে দস্যু বনহুর আর রহমান। বলিষ্ঠ দুই ভীল সর্দার যেন শিকারের অন্বেষণে চলেছে, তেজোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল— বিশাল বক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু দেখলেই মনে হয় শক্তিশালী বীর পুরুষ এরা।

❑

ঝিন্দে পৌঁছে বনহুর আর রহমান ভীল সর্দারের বেশেই ঝিন্দ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। ঝিন্দ রাজার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ বনহুর আর রহমান দুটো হরিণ শিকার করে নিয়ে গিয়েছিল, তাই দিল।

ঝিন্দ রাজা হরিণ পেয়ে অনেক খুশি হলেন। বনহুর আর রহমানকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। এই বিদেশী ভীল সর্দারদ্বয়ের যেন কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য জয়সিন্ধ তার লোকদের আদেশ দিলেন।

রাজ-অন্তপুরের একটি কক্ষে বনহুর আর রহমানের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো, কিন্তু বনহুর এতে রাজী হলো না, আপত্তি জানিয়ে বলল— মহারাজ, আমরা ভীল জাতি, আমাদের থাকার জন্য ঘরদোর দরকার হবে না, শুধু আপনার রাজ্যে থাকার অনুমতি চাই।

বৃদ্ধ মহারাজ কিছুতেই সম্মতি দান করলেন না, তিনি বললেন—হাজার হলেও আপনারা আমার অতিথি, কাজেই আপনাদের থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আমারই করা দরকার। বেশ, আমার বাগানবাড়ির একটি কক্ষে আপনাদের থাকার সুব্যবস্থা করা হবে।

শেষ পর্যন্ত বনহুর আর রহমান মহারাজ জয়সিন্ধের কথায় রাজী হয়ে গেল।

ফলে ফুলে ভরা সুসজ্জিত বৃহৎ বাগানবাড়ি।

মহারাজ জয়সিন্ধ বৃদ্ধ অবস্থায় বাগানবাড়িতে না এলেও তার পুত্র মঙ্গলসিন্ধ বাগানবাড়ি সরগরম করে রেখেছিল। কাজেই বাগানবাড়ির জৌলুস পূর্বের চেয়ে এখন আরও জাকালো রয়েছে।

বাগানবাড়ির একটি নিভৃত অংশে বনহুর আর রহমানের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বাগানবাড়ির অদূরে একটা ছোট অশ্বশালা ছিল, সেখানে তাদের অশ্ব দুটি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

রাজা স্বয়ং এই ভীল অতিথিদ্বয়কে আশ্রয় দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা তাঁর পুত্র মঙ্গল সিন্ধের কানে গেল। মঙ্গল সিন্ধ তখন বাগানবাড়ির একটি বড় কক্ষে দলবল নিয়ে বাঈজী নাচে মশগুল।

কথাটা কানে যেতেই দু'চোখ তার ধক করে জ্বলে উঠল। এ বাগানবাড়ির একমাত্র অধিকারী এখন সে। তখনই সে দু'জন সঙ্গীকে আদেশ দিল, যাও—সেই ভীল সর্দারদ্বয়কে ডেকে আন আমার কাছে।

বনহুর আর রহমান সবেমাত্র বিশ্রামের আয়োজন করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে দু'জন লোক এসে জানাল— তোমাদের দু'জনকে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ ডেকেছেন।

রহমান তাকালো বনহুরের দিকে—

বনহুর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল— গিয়ে বল আমরা ক্লান্ত এখন যেতে পারব না।

লোক দু'জন ফিরে গিয়ে কথাটা জানালো মঙ্গলসিন্ধকে।

রাগে গর্জে উঠল কুমার মঙ্গলসিন্ধ— কি বললে, এত সাহস সামান্য ভীল সর্দারের যে, আমার আদেশ অমান্য করে! যাও পুনরায় গিয়ে বল এখনি আমি তাদের চাই।

আবার লোক দুটি ছুটলো।

বনহুর এবার লোক দুটিকে দেখে সোজা হয়ে বসল, বলল— কি খবর বান্দা?

লোক দুটির একজন বলে উঠল— এখনই যেতে হবে। না গেলে চলবে না।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল— তাকেই আসতে বল, যদি তার বিলম্ব সহ্য না হয়।

এবারও ফিরে গেল ওরা।

ভীল সর্দারদ্বয়ের কথা শুনে রেগে আগুন হলো কুমার মঙ্গলসিন্ধ, ক্রুদ্ধ ভাবে উঠে দাঁড়াল চল দেখে নেব কোন রাজা মহারাজা তারা।

কুমার মঙ্গলসিন্ধ হাজির হলো বাগানবাড়ির সেই কক্ষে, যে কক্ষে দস্যু বনহুর আর রহমানকে থাকতে দেয়া হয়েছে।

মঙ্গলসিন্ধ ও তার সঙ্গীদ্বয় কক্ষে প্রবেশ করতেই রহমান উঠে দাঁড়াল বনহুর যেমন শুয়েছিল তেমনি রইলো। কোন অভিবাদন বা সম্ভাষণ জানালো না।

মঙ্গলসিন্ধের চোখে-মুখে তখন মদের নেশা, বনহুরের তাচ্ছিল্য ভাব লক্ষ্য করে হুঙ্কার ছাড়ল আমি ডেকেছিলাম কেন যাওনি?

বনহুর হেসে বলল—বিনা কারণে ডাকলে আমি যাই না।

কি বললে ভীল সর্দার, আমি তোমাকে বিনা কারণে ডেকেছি!

তা নয় তো কি?

আমি জানতে চাই কার হুকুমে তোমরা আমার বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছ?

বনহুর মৃদু হেসে বলল— তোমার পিতার কাছে এ প্রশ্ন করলে জবাব পাবে।

এ বাগানবাড়ি আমার।

না, তোমার পিতার। তাঁর আদেশেই আমরা বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি।

তিনি বৃদ্ধ, এখন তাঁর মতিভ্রম ঘটেছে। নইলে সামান্য ভীল সর্দার তার বাগানবাড়িতে স্থান লাভ করে! শোন ভীল সর্দার, যদি তোমরা মঙ্গল চাও, তবে এক্ষুনি আমার বাগানবাড়ি ত্যাগ কর।

নইলে কি করবে রাজকুমার? বলল বনহুর।

তোমাদের আমি শাস্তি দেব, কঠিন শাস্তি।

অতি উত্তম। এখন বিশ্রাম করতে দাও। যাও, তোমরা। বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

তখনকার মত কুমার মঙ্গলসিন্ধ বিদায় নিতে বাধ্য হল।

চলে যাবার সময় কটমট করে বনহুর আর রহমানের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে যেতেই রহমান বলল—সর্দার, এটা কি ভাল হলো?

তা পরে দেখা যাবে। এখন বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন, বিশ্রাম কর। বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল বনহুর।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে রহমান খেয়াল নেই তার।

হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠের করুণ তীব্র আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল রহমানের। আজ কয়েক দিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিল, তাই এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

ঘুম ভাঙতেই বিছানায় সজাগ হয়ে উঠে বসল। কক্ষের একপাশে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল তারই আলোতে রহমান দেখলো বিছানায় বনহুর নেই।

রহমানের মনের ভেতর চড়াৎ করে উঠল, তাকে না জানিয়ে এভাবে কোথায় গেছে সর্দার! বিছানা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল, দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল দরজা খোলা। ব্যাপার কি, এ অন্ধকার রাতে হঠাৎ সর্দার গেল কোথায়! যদিও বনহুর দস্যু তবু রহমান একটু আশঙ্কিত হলো। নতুন স্থান, নতুন পরিবেশ, রাত দুপুরে তাকে না জানিয়ে কোথায় গেল সর্দার? তারপর নারীকণ্ঠের তীব্র করুণ আর্তনাদ।

রহমান কান পেতে রইলো, না আর কোন শব্দই সে শুনতে পেল না।

ধীরে ধীরে দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

যদিও রহমান এবং বনহুরের শরীরে ভীল সর্দারের ড্রেস ছিল, কিন্তু নিচে ছোট্ট প্যান্ট পরা ছিল, তাতে লুকানো ছিল ছোরা আর পিস্তল। আর ছিল গুলি। প্রকাশ্যে তাদের পিঠে বাঁধা থাকত তীরধনু।

রহমান প্যান্টের পকেট থেকে ক্ষুদ্র রিভালবারখানা নিয়ে অন্ধকারে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগুলো।

বাগানবাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো রহমান, বড় ঘরটার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই শিউরে উঠল।

কুমার মঙ্গলসিন্ধের সামনে মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটি যুবতীর রক্তাক্ত মৃতদেহ।

রহমান তার উদ্যত রিভলবার হাতে খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে কে যেন তার কাঁধে হাত রাখল।

অন্ধকারে চমকে ফিরে তাকালো রহমান, অস্ফুট চাপাকণ্ঠে বলল— সর্দার। খুন!

বনহুর ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বলল— চুপ্!

পরবর্তী বই

ঝিন্দ শহরে দস্যু বনহুর

ঝিন্দ শহরে দস্যু বনহুর-১০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুর আর রহমান নিজেদের কামরায় ফিরে এলো।

যার যার বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করল তারা। রহমান শয্যায় বসে বলল– সর্দার, যুবতীটাকে হত্যা করা হয়েছে।

হ্যা রহমান, আমার মনে হয় এমনি প্রতি রাতে ওখানে একটা নারী হত্যা হয়ে থাকে।

রহমান অস্ফুট কণ্ঠে বলল– কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

ভাগ্যিস তুমি ভিতরে লাফিয়ে প্রবেশ করনি রহমান।

সর্দার আর একটু হলেই আমি ভিতরে প্রবেশ করে কুমার মঙ্গলসিন্ধকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে দিতাম।

ভুল করতে রহমান। কারণ এখনও আমরা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে সক্ষম হইনি। বিশেষ করে এখনও আমাদের অনেক জানার বাকী রয়েছে।

না জানি বৌরাণী কোথায়।

হ্যাঁ রহমান। একটু থেমে পুনরায় বলে উঠল বনহুর— কি অবস্থায় আছে সে— বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে। রহমান যদি তার কিছু হয়ে থাকে সে জন্য দায়ী আমি— আমি। আমারই ভুলের জন্য একটি সুন্দরী ফুলের মত জীবন -----

রহমান বলে উঠে— সর্দার, আমার মন বলছে, তিনি বেঁচে আছেন, আছেন—

তোমার কথা যেন সত্য হয় রহমান। বনহুর চাদরটা গায়ে টেনে শুয়ে পড়ল।

রহমানও শয্যা গ্রহণ করল।

কিন্তু কারও চোখে ঘুম নেই—একটু পূর্বে যে দৃশ্য তারা দেখেছে তা অতি জঘন্য—অতি মর্মান্তিক। এ দৃশ্য দেখার পর কারও চোখে ঘুম আসতে পারে না।

মহারাজ জয়সিন্ধের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিল বনহুর—আর রহমান ভেবেছিল সত্যি এ এক মহৎ রাজার দেশে তারা এসেছে। এ রাজ্য থেকে তারা অতি সহজেই তাদের অভিসন্ধি পূরণ করতে সক্ষম হবে।

বনহুর আর রহমানের ঝিন্দ আগমনের উদ্দেশ্যই মনিরাকে এবং তার সন্তানকে খুঁজে বের করা। অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না বনহুরের মনে। মনিরাকে খুঁজে পেলেই তারা ফিরে যাবে নিজ আস্তানায়। সৎ মনোভাব নিয়েই বনহুর আর রহমান ঝিন্দের মহারাজ জয়সিন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল যাতে তাদের আগমনে ঝিন্দবাসীদের মনে কোন সন্দেহ জাগতে না পারে।

কিন্তু প্রথম রাতেই বনহুর আর রহমান বুঝতে পারল তাদের এ আগমন যত সহজ ও স্বাভাবিক ভেবেছিল তা নয়। বিরাট একটা রহস্যজাল ছড়িয়ে রয়েছে এ রাজ্যের মধ্যে। কৌশলে এ রহস্য জাল তাকে গুটাতে হবে—এর গুপ্ত রহস্য ভেদ করতে হবে।

বনহুরের শরীরের মাংসপেশীগুলো তার চিন্তাধারার সংগে সংগে স্ফীত হয়ে উঠলো। ধমনীর রক্ত হয়ে উঠল উষ্ণ। চোখ দুটো জ্বলে উঠল ধক ধক করে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল—নরপিশাচ মঙ্গলসিন্ধ তোমার সঙ্গে আমার বুঝাপড়া হবে।

বনহুর বুঝতে পেরেছে, রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ শুধু অমানুষ নয়, সে একজন দুশ্চরিত্র এবং নারী হত্যাকারী।

বাকী রাতটুকু নানা চিন্তায় কাটল বনহুরের।

ভোরে শয্যা ত্যাগ করে বললো বনহুর—রহমান, তৈরি হয়ে নাও, বাইরে বের হব।

রহমান বলল— আমি প্রস্তুত সর্দার।

বনহুর আর রহমান ভীল সর্দারের নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করে বাগান বাড়ি থেকে বের হলো। রাজপথ ধরে হেঁটে চলল তারা।

মাত্র কিছুদূর এগিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ট্যাক্সি সাঁ করে চলে গেল তাদের পাশ কেটে। বনহুর দ্রুতহস্তে রহমানকে একটু পাশে ঠেলে দিয়ে নিজেও সরে দাঁড়িয়েছিল, নইলে তক্ষুণি তাদের চাপা দিয়ে চলে যেত গাড়িটা।

গাড়িখানা চলে যেতেই বনহুর হেসে বলল- রহমান, মৃত্যুর প্রথম আলিঙ্গন থেকে প্রথম মুক্তিলাভ।

তাইতো সদার, আর একটু হলেই গাড়িটা আমাদের চাপা দিয়েছিল আর কি—

আবার চলতে শুরু করল ওরা।

বনহুর বলল—ভেবেছিলাম ঝিন্দে এসে নিশ্চিন্তে মনিরার সন্ধান করব কিন্তু তা হলো কই।

রহমান বলে উঠল—কে এই দুশমন, যে প্রথম দিনেই আমাদের পিছু লেগেছে?

অপেক্ষা কর রহমান, শিগ্‌গিরই জানতে পারবে।

এখন কোথায় চলছেন স্যার?

কোন একটা ভাল হোটেলে।

হোটেলে কেন, সর্দার, আমরা তো----

হ্যাঁ, মহারাজ জয়সিন্ধের অতিথিরূপে আমরা বেশ আরামেই আছি, কিন্তু আমাদের আর একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন, সেখানে আমরা ভীল সর্দার নই, সভ্য নাগরিক। রহমান, একটা কথা— যতক্ষণ আমাদের বজরা সিন্ধি নদী অতিক্রম করে ঝিন্দ শহরে পৌঁছতে সক্ষম না হয়েছে, ততক্ষণ আমাদের কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না।

গোটা দিনটাই বনহুর আর রহমান ভীল সর্দারের বেশে ঝিন্দ শহরের অলিগলি বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াল। মাঝে মাঝে কোন হোটেল বা রেস্টুরেন্টে উঠে কিছু কিছু খাওয়া-দাওয়া করে নিল।

সন্ধ্যার পূর্বে বাগানবাড়িতে ফিরে এলো তারা।

বাগানবাড়িতে প্রবেশ করতেই একটা নূপুরধ্বনি তাদের কানে এসে পৌঁছল।

বনহুর বলল— চলো রহমান, মঙ্গলসিন্ধের আমোদ কক্ষে যাই, একটু নাচগান দেখে আসি।

হ্যাঁ রহমান, এসো।

বনহুর আর রহমান মঙ্গলসিন্ধের আমোদ কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়াল।

কক্ষে তখন পুরদমে নাচগান চলছে।

একদল মাতালের সঙ্গে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে বসে আছে। সামনে কয়েকটা বোতল এবং কাঁচপাত্র।

বনহুর আর রহমানকে দেখতে পেয়ে মঙ্গলসিন্ধ সোজা হয়ে বসল, চোখেমুখে ফুটে উঠল একটা বিদ্রুপভরা হাসির আভাস। মঙ্গলসিন্ধ তার বিশিষ্ট বন্ধু কঙ্কর সিংকে লক্ষ্য করে মৃদু করে কিছু বলল।

কঙ্করসিং উঠে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বনহুর ও রহমানকে অভ্যর্থনা জানাল,—এসো এসো ভীল সর্দার, বস।

বনহুর আর রহমান একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিল। বনহুর এগিয়ে গিয়ে আসন গ্রহণ করল। রহমান তাকে অনুসরণ করল।

একটা নর্তকী তখন নেচে চলেছে।

একপাশে কয়েকজন বাদ্যকর বসে বাজনা বাজাচ্ছিল।

বনহুর আর রহমান বসলো ওপাশে ভিন্ন একটা জায়গায়।

নর্তকীর নাচ-গানে মুগ্ধ হলো বনহুর। সে আপন মনে নর্তকীর নাচ দেখতে লাগল। অপূর্ব, অদ্ভুত সে নাচ।

রহমানের চোখে যদিও নর্তকীর দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু তার দৃষ্টিছিল মঙ্গলসিন্ধের মুখে এবং কক্ষের সকলকেই সে দেখছিল।

মঙ্গলসিন্ধের ইঙ্গিতে একজন লোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এটাও লক্ষ্য করল রহমান।

বনহুর আজ তন্ময় হয়ে গেছে ঝিন্দ নর্তকীর নাচ দেখে। নানারকম অঙ্গিভঙ্গি করে নেচে চলছে নর্তকীটি।

একটু পরে লোকটা ফিরে এলো, হাতে তার নতুন একটা মদের বোতল। কিন্তু রহমান সূক্ষ্নভাবে লক্ষ্য করল, বোতলটা নতুন হলেও বোতলের ছিপি সম্পূর্ণ আলগা।

রাজকুমার জয়সিন্ধের ইঙ্গিতে বোতলটা কঙ্করসিংয়ের হাতে দিল লোকটা।

কঙ্কর সিং একটা কাঁচের পাত্র হাতে তুলে নিয়ে বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে নর্তকীর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

নর্তকী নাচতে নাচতে এগিয়ে এলো কঙ্কর সিংয়ের নিকটে, নাচের ভঙ্গীমায় হাতখানা সে বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

কঙ্কর সিং মদের পাত্রটা নর্তকীর হাতে দিয়ে তার কানে মুখ নিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল—দক্ষিণ ধারের ভীল সর্দারকে দাও।

নর্তকী মদের পাত্র হাতে নিয়ে ঘূর্ণি হাওয়ার মত ঘুরপাক খেয়ে এগিয়ে চলল। প্রথমে সে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধের সম্মুখে মদের পাত্রটা

এগিয়ে ধরল। মঙ্গলসিন্ধ মদের পাত্র যেমনি হাত বাড়িয়ে নিতে গেল অমনি নর্তকী সুকৌশলে সরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ভীল সর্দার বেশি বনহুরের সম্মুখে। মদের পাত্রটা এগিয়ে ধরল তার দিকে।

বনহুর অন্যমনস্কভাবে নর্তকীর হাত থেকে মদের পাত্রটা হাতে নিতে গেল।

অমনি রহমান হাত বাড়িয়ে নর্তকীর হাত থেকে মদের পাত্রটা নিয়ে নিল হাতে।

কক্ষে সবাই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল।

বনহুর অবাক হয়ে তাকাল রহমানের মুখের দিকে। হঠাৎ তার এ আচরণের জন্য বিস্মিত হলো সে।

রহমান মদের পাত্রটা হাতে নিয়ে নিজের মুখে দিতে গেল, অমনি হাত ফস্কে পড়ে গেল মেঝেতে।

কাঁচের টুকরোগুলো খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল চারদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর উঠে দাঁড়াল।

বনহুর উঠে দাঁড়াতেই রহমানও উঠে পড়ল।

নর্তকী চকিতে একবার রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিল। সেও উঠে দাঁড়াল চট করে। তারপর বনহুরের দক্ষিণ বাহুর উপর মাথা রেখে বলল— তুম্ হারামা পিয়ার হো।

বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে উঠল বাঁকা হাসির রেখা, বলল—তুমবি মেরা পেয়ার।

নর্তকী আর ঘনিষ্ঠভাবে বনহুরকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছিল, বনহুর পূর্বের ন্যায় হেসেই বলল—ফির মোলাকাত হোকি। বনহুর বেরিয়ে গেল, রহমান তাকে অনুসরণ করল।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে যেতেই মঙ্গলসিন্ধ কঙ্কর সিংকে লক্ষ্য করে বললো— দেখেছ?

কঙ্কর সিং ঠোঁট উল্‌টে অবজ্ঞাভরে বলল- দেখেছি।

মঙ্গলসিন্ধ বলল— কি মনে হলো?

অদ্ভুত চিজ বলে মনে হলো কুমার। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ বলে মনে হলো না।

আমারও সেই রকম সন্দেহ হচ্ছে।

মনে হচ্ছে নয় কুমার, একেবারে বাগানবাড়িতে যাকে তাকে স্থান দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি।

এটা আমার বাবার দোষ। বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। শুধু তাই নয় কঙ্কর, বাবা আজকাল রাজকোষ থেকে আমার ভাতার পরিমাণও কমিয়ে দিয়েছে।

কি বললে, তোমার প্রাপ্য টাকা থেকে তুমি বঞ্চিত। যাই বল কুমার, তুমি বলেই বুড়ো রাজাকে আজও তোয়াজ করে চলছ। কেন, রাজ্য চালাবার বয়স কি তোমার হয়নি?

কি করব বল, পিতা গুরুজন—কাজেই তিনি বেচে থাকা পর্যন্ত আমাকে এসব সহ্য করেই চলতে হবে। তাছাড়া আর একটা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কি সমস্যা কুমার?

বাগানবাড়িতে আমরা আমোদ-প্রমোদ করি, এ কথা তিনি জানতে পেরে আমার নিকটে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন।

কি জবাব দিয়েছ বন্ধু?

আমরা ক'জন বন্ধু-বান্ধব মিলে একটু গান-বাজনা করি, এটাই কি আপনার সহ্য হয় না, তাহলে আমি দেশ ত্যাগী হবো।

কি বললেন মহারাজ?

একমাত্র সন্তান আমি, দেশ ত্যাগী হলে চোখে অন্ধকার দেখবে, কাজেই বুঝতে পারছো.....

বেশ, বেশ বন্ধু.....

নর্তকী তখন দুটি কাঁচপাত্রে মদ ঢেলে এগিয়ে ধরে কুমার মঙ্গল সিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের দিকে।

❑

কেঁদে কেঁদে মনিরার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। সঙ্গী মেয়েদের অবস্থা তার মনে ভীষণ ভয় লাগিয়ে দিয়েছে। কারণ তার কক্ষে একটা একটা করে অনেকগুলো মেয়ে এসে জড়ো হয়েছিল। সকলের কি

মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে, সব দেখেছে মনিরা। এখন বাকী সে আর একটি মেয়ে—এ মেয়েটি সবচেয়ে বেশি কুৎসিত বলে তার জন্য গ্রাহক হয়নি, আর মনিরা সবচেয়ে সুন্দরী বলে তাকেও কেউ কিনতে পারেনি। মনিরার মূল্য অন্যান্য যুবতীর তুলনায় চারগুণ বেশি—কাজেই মনিরা রয়েই গেছে।

কিন্তু প্রতিমুহূর্তে সে অপেক্ষা করছে, কোন সময় তার অবস্থাও সঙ্গীনিদের মত হবে। তাঁর সম্মুখেই কত মেয়েকে হাত-পা-মুখ বেধে চালান করা হলো। কতজনকে নানা রকম শাড়ি গয়না অলঙ্কারের লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। কতজনকে চাবুক মেরে আঘাতের পর আঘাত করে পাঠিয়ে দেয়া হলো। মনিরা জানে, কোথায় তাদের পাঠানো হচ্ছে। কোথায় তারা চলে যাচ্ছে। যারা যাচ্ছে তারা আর কোনদিন ফিরে আসবে না আসতে পারে না।

অহরহ চোখের পানি আজ মনিরার সম্বল। আজ মনে পড়ে স্বামীর কথা—মনে পড়ে শিশু নূরের কথা। মনে পড়ে স্বামীর স্নেহময় আদর-যত্নের কথা।

প্রাণের মায়া মনিরার পূর্ব থেকেই ছিল না, আজও সে করে না। শুধু চিন্তা ইজ্জতের। প্রদীপের ক্ষীণ আলোর মত একটা আশার স্বপ্ন এখনও মনিরার মনে জেগে রয়েছে। একদিন তার স্বামীর ভুল ভাঙবে—বুঝতে পারবে তার মনিরা সত্যি অসতী নয়। এ বিশ্বাস যেন তার অটুট থাকে, এটাই শুধু কামনা করে সে।

তাই মনে-প্রাণে সদা খোদাকে স্মরণ করে—হে দয়াময় খোদা, তুমি আমার ইজ্জত রক্ষা কর। আমাকে তুমি পাপিষ্ঠদের হাতে থেকে বাঁচিয়ে নাও।

একদিন মনিরা গভীর রাতে বসে বসে নামায পড়ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল বিশাল বপু মহিলাটি।

মনিরাকে নামায পড়তে দেখে রাগে বোমার মত ফেটে পড়ল। তখনই হাতে তালি দিল, সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে মত লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করল।

লোক দুটি আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

বিশাল বপুধারিনী হেমাঙ্গিনী বললো—একে নিয়ে চলো।

মনিরা তখন নামায শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকাল হেমাঙ্গিনী আর ঐ জমকালো বেঁটে লোক দু'টির দিকে।

হেমাঙ্গিনী গর্জে উঠল–লিয়ে চল্ বেটারা, হা করে কি দেখছিস্।

মনিরার দেহে প্রাণ নেই যে, অন্যান্য যুবতীর মর্মবিদারক দৃশ্যগুলো তখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। বুঝতে পারল আজ তার পালা, এই বুঝি তার জীবনের শেষ মুহূর্ত।

বেঁটে লোক দুটি মনিরাকে তখন এঁটে ধরে ফেলেছে। সেকি ভীষণ শক্তি তাদের দেহে। যেন অসুরের বল।

মনিরাকে যখন লোক দুটি জোর করে ধরলো তখন মনিরার সঙ্গিনী সেই কুৎসিত মেয়েটি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল, ছুটে গিয়ে ওদের দু জনকে ছাড়িয়ে দিতে গেল।

সেই সময় হেমাঙ্গিনী হাতের বেত দিয়ে সপাং করে একটা আঘাত করল মেয়েটার শরীরে।

আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটা।

হেমাঙ্গিনী প্রচণ্ড এ ধাক্কায় ফেলে দিল ওকে মেঝেতে।

এবার মনিরাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে চলল বেঁটে লোক দু'টি।

হেমাঙ্গিনী চলল সবার আগে।

কোথা দিয়ে কোথায় যে তাকে নিয়ে এলো মনিরা বুঝতেই পারল না। একটা মস্তবড় সুসজ্জিত কক্ষ। বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। মনিরাকে সেই কক্ষে ঠেলে দিয়ে লোক দুটো চলে গেল—সামনে দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গিনী।

কক্ষের ভিতরে ঢুকতেই শিউরে উঠল। একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে, চোখেমুখে তার লালসাপূর্ণ কুৎসিত চাহনি—হেমাঙ্গিনী বলে উঠল--- এই সেই মেয়ে দেখুন।

লোকটা মনিরাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল—খাসা চেহারা, কিন্তু-----

আর কিন্তু নয়, দেখুন যদি পছন্দ হয় তবে ঐ পুরোপুরিই দিতে হবে।

তা টাকার জন্য বাধবে না, যা চাও পাবে।

পছন্দ তাহলে হয়েছে?

চমৎকার চেহারা!

হ্যাঁ, হাজারে এমন একটা পাওয়া মুশকিল—বলল হেমাঙ্গিনী।

লোকটা এগিয়ে গিয়ে হেমাঙ্গিনীর কানে কানে কি যেন বলল, তারপর একতোড়া নোট হেমাঙ্গিনীর হাতে গুঁজে দিল।

হেমাঙ্গিনী একটু হেসে বেরিয়ে গেল।

মনিরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। হায়, এ মুহূর্তে তাকে কে বাঁচাবে, কে তাকে রক্ষা করবে! মনিরা লোকটার দিকে তাকাল। আর একদিন সে এমনি অবস্থায় পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত খুন করতে বাধ্য হয়েছিল সে; কিন্তু আজ সে কি উপায়ে নিজেকে রক্ষা করবে, কোথায় লুকাবে—

লোকটা লালসাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসছে।

মনিরা তাকাল দরজার দিকে, দরজা ভেজানো।

ওদিকের টেবিলে কয়েকটা মদের বোতল সাজানো। আর কয়েকটা কাঁচের গ্লাস।

মনিরা একবার বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে নিল।

লোকটা এগিয়ে আসছে তার দিকে। কি ভয়ংকর তার চেহারা! লোকটা নিশ্চয়ই মদ খেয়েছে, পা দু'খানা ওর টলছে।

লোকটা যতই এগিয়ে আসছে, মনিরা ততই ঐ টেবিলটার দিকে এগুচ্ছে, যে টেবিলে সাজানো রয়েছে কয়েকটা মদের বোতল।

হঠাৎ মনিরা ছুটে গিয়ে একটা বোতল তুলে নিল হাতের মুঠায়।

মাতালটা তখনও দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে!

মনিরা বোতলটা ছুড়ে মারল লোকটার মাথা লক্ষ্য করে।

মুহূর্তে একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেল। মনিরার নিক্ষিপ্ত বোতলটা লোকটার মাথায় লেগে খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

লোকটার মাথা কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল।

মনিরা দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মাথায় আহত জায়গাটা চেপে ধরে লোকটাও ছুটলো পিছু পিছু।

মনিরা কিছুদূর এগুতেই দেখল সামনে যমদূতের মত দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গিনী; খপ্ করে ধরে ফেলল সে মনিরাকে!

ততক্ষণে মনিরার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে শয়তান মাতালটা। তার সমস্ত শরীর রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে।

হেমাঙ্গিনী ক্রুদ্ধ সিংহীর ন্যায় গর্জন করে উঠল। একবার নয়, দু'বার তার পাওয়া টাকা হাতছাড়া হয়ে গেল। রাগে মনিরার গলাটা দু'হাতে টিপে ধরলো, দাঁতে দাঁত পিষে বলল— তোকে খুন করব!

লোকটা বলে উঠল—আগে আমার টাকা ফেরত দাও, তারপর ওকে যা খুশি কর!

হেমাঙ্গিনী এবারও বাধ্য হলো লোকটার টাকা ফেরত দিতে।

হেমাঙ্গিনী লোকটার টাকা ফেরত দিয়ে পুনরায় মনিরার গলা টিপে ধরলো। নিশ্চয়ই এবার ওকে হত্যা না করে ছাড়বে না। জোরে, খুব জোরে চাপ দিচ্ছে, মনিরার চোখ দুটো কপালে উঠেছে, এবার হয়তো তার জীবন শেষ!

হঠাৎ হেমাঙ্গিনীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো গাদা গাদা টাকার বাণ্ডিল। মনিরাকে হত্যা করলে এতগুলো টাকা তার বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে! হেমাঙ্গিনীর হাত দু'খানা আপনা আপনি শিথিল হয়ে এলো। মনিরাকে ছেড়ে দিল সে।

এরপর থেকে শুরু হলো মনিরার ওপর নির্মম অত্যাচার। প্রতিদিন তাকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে পঁচিশ ঘা বেত মারা হতে লাগল, আর জিজ্ঞাসা করা হতে লাগল, সে ও-রকম কাজ আর করবে কি না। কিন্তু মনিরা পঁচিশ ঘা বেত খেয়েও বলত—সে ও-কাজ করবে।

হেমাঙ্গিনীর কড়া আদেশ, যতদিন মনিরা স্বীকার না করবে বা রাজী না হবে ততদিন এভাবে বেত্রাঘাত করা হবে।

রোজ মনিরার ওপর এই অকথ্য অত্যাচার চলতে লাগল।

ইতোমধ্যে আরও চারজন যুবতী পাকড়াও করে আনা হয়েছে। পূর্বের শূন্যতা আবার পূর্ণ হয়েছে। সে এক করুণ দৃশ্য! সব মেয়েই কাঁদছে, মাথা কুটে কাঁদছে। সবাই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে কন্যা-বধু।

আজকাল হেমাঙ্গিনীর ব্যবসা আরও ফেঁপে উঠেছে। শুধু নারী ব্যবসাই নয়, শিশু ব্যবসাও সে শুরু করেছে! বিভিন্ন দেশে তার অনুচর ছড়িয়ে রয়েছে। যেখানে যা সুবিধা করতে পারে সে তাই করছে। ছোট ছোট মেয়েকে চালান দেওয়া হয় এ দেশ থেকে সে দেশে।

নারীদেরও সেই অবস্থা!

হেমাঙ্গিনীর সহকারিগণের সংখ্যা এখন অনেক বেশি। ব্যবসা চলছে পুরাদমে।

১

❑

অশ্বপৃষ্ঠে দস্যু বনহুর আর রহমান ঝিন্দ শহরের শেষ সীমান্তে ভাগিন্দী নদীর তীরে এসে দাঁড়াল। তাদের বজরা আজ পৌঁছে গেছে। বনহুর আর রহমান নিজেদের বজরায় এসে উপস্থিত হলো।

বনহুর নিজের অনুচরগণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করল। পথে তাদের কোন অসুবিধা বা কোন বিপদ্ এসেছিল কিনা তাও জেনে নিল।

না, কোন অসুবিধা বা বিপদের সম্মুখীন হয়নি তার অনুচরগণ। বনহুর আশ্বস্ত হলো।

বনহুর বজরায় প্রবেশ করে নিজের গোপন অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরীক্ষা করে নিল।

বনহুর আর রহমান যখন বজরা থেকে ফিরে এলো তখনও তাদের শরীরে পূর্বের সেই ভীল সর্দারের ড্রেস। বাগানবাড়িতে প্রবেশ করে নিজের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করল তারা।

বনহুর আর রহমান একই কক্ষে ঘুমাতো।

সেদিন বাইরে থেকে ফিরতেই একজন রাজকর্মচারী বলল- ভীল সর্দার, আপনাদের কুমার মঙ্গলসিন্ধ পৃথক পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করেছেন।

রহমান অবাক কণ্ঠে বলল—কেন?

রাজকর্মচারী বলল—আপনাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেই কারণে এরকম সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

রহমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বনহুর বাধা দিয়ে বলল- তোমাদের কুমার বাহাদুরকে আমার ধন্যবাদ জানাবে। তার এই সুব্যবস্থার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

রাজকর্মচারী চলে গেল।

রহমান তাকাল বনহুরের দিকে—সর্দার!

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল—যাও রহমান, তোমার নিজ বিশ্রাম-কক্ষে যাও।

রহমান কোনদিন তাদের সর্দারের কথার প্রতিবাদ করেনি। আজও সে পারল না, চলে গেল তার নিজের বিশ্রামকক্ষে। যদিও রহমান নিজের কক্ষে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করল, কিন্তু মন তার সদা আশঙ্কাগ্রস্ত রইলো। নিশ্চয় এর পেছনে কোন কারণ রয়েছে।

বনহুরও নিজের কক্ষে প্রবেশ করল।

অন্যদিন হলে বনহুর তার ভীল সর্দারের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে শয্যা গ্রহণ করত। আজ সে ঐ বেশে শয্যায় গিয়ে বসল। একটা নতুন কোন কিছুর প্রতীক্ষা করতে লাগল সে।

রাত বেড়ে আসছে।

বনহুর বিছানায় শুয়ে নিশ্চুপ চোখ বন্ধ করে রয়েছে।

পাশের ঘরে রহমানও বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে, আর মাঝে মাঝে উঠে নিজের জানালা দিয়ে সর্দারের কক্ষে উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে।

রহমান যে কক্ষে শুয়েছে সে কক্ষের জানালা দিয়ে বনহুরের কক্ষের কিছুটা অংশ দেখা যায়। বিশেষ করে বনহুরের শয্যার কিছুটা ওর নজরে পড়ে। রহমান আজ সর্দারকে ছদ্মবেশ পরিবর্তন না করেই শয্যা গ্রহণ করতে দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিল। তারপর বুঝে নিয়েছিল নিশ্চয়ই সর্দার এই বেশেই রাত্রিতে বের হয়। সে কারণে সেও ঘুমাতে পারেনি, সর্দার যদি বাইরে বের হয় তবে রহমানও চুপ করে শুয়ে থাকবে না, এটাই ছিল তার মনোভাব এবং সে কারণেই রহমান বারবার জানালায় উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছিল কি করছে তার সর্দার।

প্রহরের পর প্রহর গড়িয়ে চলেছে।

রোজই বাগানবাড়ির ওপাশ থেকে ভেসে আসে নর্তকীর পায়ের নূপুরের শব্দের সঙ্গে নানা কণ্ঠের হাস্যধ্বনি আর করতালি। আজ কিন্তু বাগানবাড়ি বেশ নীরব রয়েছে। কুমার মঙ্গলসিন্ধ কোথাও গেছে হয়ত, তাই আজ বাগানবাড়ি এমন নিশ্চুপ।

রহমান কখন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে খেয়াল নেই ওর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার, একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে। সর্দারের কক্ষ

থেকে শব্দটা ভেসে আসছে। রহমান চট করে শয্যা ত্যাগ করে জানালার শার্সীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চমকে উঠল রহমান, মঙ্গলসিন্ধের আমোদকক্ষের নর্তকী তার সর্দারের পাশে বসে, সর্দারের দক্ষিণ হাতখানা নর্তকীর মুঠায় ধরা রয়েছে। আবেগভরা কণ্ঠে কি যেন বলছে নর্তকী। ওর গলায় আওয়াজ শুনা যাচ্ছে কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে না।

নর্তকী বনহুরের কাঁধে মাথা রাখল।

বনহুর কি যেন বলছে, ঠিক বুঝা না গেলেও এটুকু শুনতে পেল রহমান, তুমহারে লিয়ে মাইভি বহুৎ পেরেশান... এরপর আর কিছুই বোঝা গেল না।

নর্তকী বাহু দু'টি দিয়ে সর্দারের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরেছে।

রহমান আর দাঁড়াতে পারল না—একটা লজ্জা তাকে সরিয়ে নিল জানালা থেকে।

সর্দারের হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তবে কি সর্দার ভুলে গেল তার কর্তব্য! একটা নারীর মোহ তাকে অভিভূত করে ফেললো! রহমানের মনে গভীর একটা অভিমান চাড়া দিয়ে উঠল!

নিজের শয্যায় পুনরায় শুয়ে পড়ল। এ কারণেই বুঝি মঙ্গলসিন্ধ সর্দারকে ভিন্ন কামরায় শোবার ব্যবস্থা করেছিল। রহমানের মনে পড়ল, সেদিন রাতে নর্তকী যে মদের পাত্র তার সর্দারের সম্মুখে বাড়িয়ে ধরেছিল তার মধ্যে মেশানো ছিল হয়ত মারাত্মক বিষ। আজও নর্তকী কোন মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে তার সর্দারের নিকটে এসেছে,..এটা সত্য। রহমান আবার শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে দাঁড়াল সেই জানালার পাশে।

একি, সর্দার আর নর্তকী দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

রহমান মুহূর্ত বিলম্ব না করে, দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। বনহুর আর নর্তকীর পেছনে দাঁড়াল, বলল—সর্দার!

চমকে ফিরে দাঁড়াল বনহুর।

নর্তকী আরও বেশি চমকে উঠলো, বাগানবাড়ির অন্ধকারে তাকাল সে রহমানের মুখের দিকে।

বনহুর বুঝতে পারল, রহমান তাকে বাইরে যেতে নিষেধ করছে। একটু হেসে বলল—এক্ষুণ আসছি রহমান, একে একটু পৌঁছে দিয়ে আসি।

সর্দার, আমিই তো রয়েছি। এসো—নর্তকীকে লক্ষ্য করে বলল রহমান।

অগত্যা নর্তকী রহমানের সঙ্গে যেতে বাধ্য হলো।

বনহুর ফিরে এলো নিজের কামরায়।

মঙ্গলসিন্ধ পায়চারী করছে, চোখে তার ক্রুদ্ধ ভাব।

কঙ্কর সিং একপাশে দাঁড়িয়ে, হাতে তার সুতীক্ষ্ণধার ছোরা। ছোরাটা সে হাতের মধ্যে নাড়ছে। বিদ্যুতের আলোতে ঝক্‌ঝক উঠছে ছোরাটা।

সামনে নর্তকীটি, নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে সে।

মঙ্গলসিন্ধ গর্জন করে উঠল—এটুকুই তুমি পারলে না সিমকী। তোমাকে দিয়ে আমার কিছু হবে না।

নর্তকী সিমকী হাত জুড়ে বলল—মেরী কোই কসুর নেহি কুমার বাহাদুর। ও তো মেরী সাথ আতে থে। লেকিন উস্‌কা সাথ যো আদমী হ্যায় ও সব কুছ বরবাদ কিয়া.....

কঙ্কর রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে বলে উঠল—কুমার, আজ সুযোগ নষ্ট হলো, এরপর যেন না হয়।

মঙ্গলসিন্ধ কঙ্কন সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমিই তো আমার ভরসা কঙ্কর!

তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, ভীল সর্দারের তাজা রক্ত আমি নিঃশেষ করে দেব।

মঙ্গলসিন্ধ এবার বলল–হাঁ, ঐ লোক দু'টিই যেন আমার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার নর্তকীকে লক্ষ্য করে বলল সে– তুমি এখন যেতে পার সিমকী।

সিমকী সালাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়র মধ্যে শুরু হলো গোপন আলোচনা। ভীল সর্দারদ্বয়কে কি করে তাড়ানো যায়, এ নিয়ে চলল তাদের নানারকম পরামর্শ।

প্রথম থেকেই মঙ্গলসিন্ধের চক্ষুশূল হয়ে এসেছে এই ভীল সর্দারদ্বয়।

এদের চালচলন আর কথাবার্তা মঙ্গলসিন্ধের মনে সৃষ্টি করছে একটা বিষকর জ্বালা। সামান্য ভীল সর্দার হয়ে প্রথম দিনই তার কথা অমান্য করেছে—এ কম অপরাধ নয়! তাছাড়া ভীল সর্দারের অপরূপ সৌন্দর্য রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধের মনে ঈর্ষার সৃষ্টি করছে।

এদের আগমনে মঙ্গলসিন্ধ আর তার বন্ধু কঙ্করসিং মোটেই খুশি হতে পারেনি। বাগানবাড়িতে তারা যা খুশি তাই করে যাচ্ছিল—তাদের কাজে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভীল সর্দার দু'জন, ইচ্ছামত তাদের বাসনা সিদ্ধ হচ্ছে না এখন।

❑

সেদিন দ্বিপ্রহরে নদীতীরে কয়েকজন যুবতী আপন মনে স্নান করছিল। কেউ সাঁতার কাটছিল, কেউ বা গুণ গুণ করে গান গাইছিল। কেউ হাত নেড়ে নদীর পানি নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিলো আর একজন যুবতীর গায়ে।

এমন সময় মঙ্গলসিন্ধ ও তার বন্ধু কঙ্কর সিং দু'জন দুটি অশ্বে নদীর তীর গিয়ে দাঁড়াল।

যুবতীগণ নদীবক্ষে আপন মনে সাঁতার কাটলেও তারা দেখতে পেল রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্করসিংকে। তাড়াতাড়ি ওরা নিজেদের কাপড় সংযত করে নিয়ে ঘাটের পাড়ে এসে দাঁড়াল। ভয়-বিহবল আর সঙ্কুচিতভাবে যুবতীগণ এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের মধ্যে ইংগিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল।

কঙ্কর সিং চট করে অশ্ব থেকে নেমে এগিয়ে গেল যুবতীদের দিকে।

যুবতীরা তখন সবাই এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে।

কঙ্কর সিংকে লক্ষ্য করে মঙ্গলসিন্ধ আংগুল দিয়ে একটা সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়ে দিল।

কঙ্কর সিং খপ্ করে তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনল মঙ্গলসিন্ধের অশ্বের পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। একসঙ্গে সবাই বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার শুরু করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর আর রহমান অদূরস্থ একটা পথ ধরে কোথাও যাচ্ছিল। যুবতীদের আর্তনাদ তাদের কানে এসে পৌঁছল।

রহমান বলে উঠল—সর্দার, নিশ্চয়ই নদীতীরে যুবতীর দল স্নান করছিল, হয়তো কুমীরে কাউকে নিয়ে গেছে.......

বনহুর বলে উঠল—চলো দেখি!

বনহুর আর রহমান দ্রুত ছুটে গেল নদীতীরে। কিন্তু নদীতীরে পৌঁছে বিস্ময়ে চমকে উঠলো, রহমান আর বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠল ধক্ করে। কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল; দক্ষিণ হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো।

মঙ্গলসিন্ধ অশ্বপৃষ্টে বসে একটা যুবতীর দক্ষিণ হাত টেনে ধরেছে আর কঙ্কর সিং যুবতীটিকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে দেবার জন্য চেষ্টা করছে। যুবতীটি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে ওদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেবার জন্য ধস্তাধস্তি করছে।

আর অন্যান্য যুবতী আর্তকণ্ঠে চিৎকার করছে—বাঁচাও— বাঁচাও......

বনহুর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল কঙ্কর সিংয়ের ওপর। প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল ওর নাকে। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কর সিং মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

মঙ্গলসিন্ধের দু'চোখ হতে আগুন ঠিকরে বের হতে লাগল। মুখের শিকার নষ্ট হলে যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে হিংস্র বাঘ, ঠিক তেমনি হলো তার অবস্থা।

যুবতীটি ছাড়া পেয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

কঙ্কর সিং এবার গায়ের ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল, কোন কথা বলার সাহস হলো না তার।

মঙ্গলসিন্ধ রাগে গজগজ করছে, কিন্তু সেও কিছু উচ্চারণ করল না।

মঙ্গলসিন্ধ অশ্বপৃষ্ঠে ছিল।

কঙ্কর সিং এবার নিজের অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসল, একবার তীব্র কটাক্ষে বনহুর আর রহমানের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলসিন্ধের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর দ্রুত চলে গেল সেখান থেকে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং।

বনহুর আর রহমান এবার যুবতীটির দিকে তাকাল।

সেই যুবতীটিও তখন নিজের দলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা সবাই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে, কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

বনহুর আর রহমান নিজেদের গন্তব্যপথে পা বাড়াল।

রাজসভায় মহারাজ জয়সিন্ধ বসে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন—সেখানে উপবিষ্ঠ রাজ-পরিষদগণ! এমন সময় পূর্বদিনের সেই যুবতী এবং তার বৃদ্ধ পিতা রাজসভায় এসে হাজির হলো।

প্রথমে বাধা দিচ্ছিল রাজকর্ম চারিগণ।

রাজা আদেশ দিলেন— আসতে দাও।

যুবতী এবং তার পিতা এসে হাত জুড়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল—মহারাজ, একি অন্যায় অত্যাচার। বিচার করুন মহারাজ, বিচার করুন....

মহারাজ চিরদিনই প্রজাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। বৃদ্ধের চোখের পানি তাঁর অন্তরে আঘাত করল, বললেন—কে তোমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেছে, বল?

বৃদ্ধ পুনরায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল—মহারাজ, যদি অভয় দেন তবে বলতে পারি।

মহারাজ জয়সিন্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান রাজা, এ কথায় তিনি বৃদ্ধাকে অভয় দিয়ে বললেন—তুমি স্বচ্ছন্দে বল।

বৃদ্ধ হাত জুড়ে বিনীত কণ্ঠে বলল—মহারাজ, আমার কন্যা এবং তার কয়েকজন সঙ্গিনী নদীতে স্নান করছিল। এমন সময়— বৃদ্ধ ভয়বিহ্বল চোখে তাকাতে লাগল চারদিকে, এমন সময়—আপনার—থেমে পড়ল বৃদ্ধ।

মহারাজ জয়সিন্ধ বললেন—বল, কি বলতে চাও তুমি?

মহারাজ, আপনার পুত্র ও তার বন্ধু কঙ্কর নদীতীরে পৌছে আমার কন্যাকে জোরপূর্বক হরণ করার চেষ্টা করছিল—

ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করে উঠলেন রাজা জয়সিন্ধ—এ কথা সত্য?

এবার যুবতী বলে উঠল—হাঁ, মহারাজ এ কথা সত্য। সেই মুহূর্তে দু'জন ভীল সর্দার সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেয়।

মহারাজ জয়সিন্ধ বলে উঠলেন—কে সেই মহান ভীল সর্দারদ্বয়?

বৃদ্ধ বলে উঠল—তারা আপনার অতিথি ভীল সর্দারদ্বয়।

মহারাজার চোখেমুখে একটা কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল। তার মহান অতিথিদ্বয়ের মহৎ উপকারের জন্য হৃদয়ে গর্ব অনুভব করলেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, সেনাপতি গুপ্ত সেনকে লক্ষ্য করে বললেন—সেনাপতি, এক্ষণি মঙ্গল ও তার বন্ধু কঙ্করকে ডাকুন, আমি এর বিচার করব। আর শুনুন, বাগানবাড়ি থেকে আমার ভীল অতিথিদ্বয়কে ডেকে আনবেন।

সেনাপতি তখনই বেরিয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং সহ সেনাপতি গুপ্তসেন ফিরে এলেন। তাদের পেছনে পেছনে প্রবেশ করল বনহুর আর রহমান।

ভীল সর্দারের বেশে বনহুরকে বড় সুন্দর লাগছিল। মাথায় পালকের মুকুট, বাজু এবং গলায় কাল ফিতার চওড়া তাবিজ বাঁধা, কানে বালা, হাতেও বালা। পিঠের সঙ্গে তীরধনু বাঁধা রয়েছে।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের মুখ শুকিয়ে চুন হলো, যখন তারা দেখল–মহারাজার সামনে দণ্ডায়মান নদীতীরের সেই যুবতীটি ও তার পিতা। বুঝতে কিছু বাকী থাকে না তাদের। সকলের অলক্ষ্যে একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিল ওরা দু'জনে।

মহারাজ জয়সিন্ধ পুত্র এবং তার বন্ধু কঙ্কর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠলেন—এ কথা সত্য? তোমরা এই যুবতীটিকে হরণের চেষ্টা করেছিলে?

মঙ্গলসিন্ধ পিতার কথায় ফিরে তাকাল যুবতীর দিকে, তারপর একটা ঢোক গিলে বলল—ওকে চিনি না।

বনহুর এগিয়ে এলো, গম্ভীর কণ্ঠে বলল—মিথ্যে কথা! কাল নদীতীরে এই যুবতীকে এরা দু'জনে জোর করে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল মহারাজ। আংগুল দিয়ে মঙ্গল ও কঙ্করকে দেখিয়ে দিল বনহুর।

ক্রুদ্ধভাবে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল মঙ্গলসন্ধি, কঙ্কর সিংও সকলের অলক্ষ্যে দাঁতে দাঁত পিষল। ওদের যত রাগ গিয়ে পড়ল বনহুরের ওপর।

মহারাজ বলে ওঠেন—নারীহরণের চেষ্টার জন্য আমি তোমাদের দু'জনকে শাস্তি দিচ্ছি। তোমরা দু'জন এই রাজসভায় নাকে কানে খৎ দিয়ে বল, আর অমন কাজ করবে না।!

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো মঙ্গল ও কঙ্কর রাজসভায় দাঁড়িয়ে নাকে কানে খৎ দিতে।

রাগে-অপমানে মঙ্গলসিন্ধের মুখমণ্ডল কাল হয়ে উঠল, এর চেয়ে তার পিতা যদি তাদের হত্যার আদেশ দিতেন তাতেও দুঃখ ছিল না। প্রকাশ্য রাজসভায় এতগুলো লোকের সামনে এই অপমান মঙ্গলসিন্ধ আর কংকর সিংয়ের মনে আগুন জ্বেলে দিল।

মহারাজ জয়সিন্ধ নিজের কণ্ঠ থেকে মহামূল্য হার খুলে পরিয়ে দিলেন ভীল সর্দারবেশী দস্যু বনহুরের কণ্ঠে। তারপর বললেন— আমার রাজ্যে মা-

বোনদের প্রতি যারা অন্যায় আচরণ করে তাদের আমি চরম শাস্তি দিয়ে থাকি, আর যারা তাদের মর্যাদা দেয় তাদের আমি করি শ্রদ্ধা।

মহারাজের এই শ্রদ্ধাপূর্ণ উপহার অবহেলা করতে পারল না বনহুর, মহারাজার হাত চুম্বন করে আনন্দ প্রকাশ করলো সে।

এ দৃশ্য রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধের হৃদয়ে কষাঘাত করল। একটা প্রচণ্ড ঈর্ষার আগুন দগ্ধীভূত করে চলল তাকে!

এরপর মঙ্গল এবং কঙ্কর নতমস্তকে রাজসভা ত্যাগ করল।

❑

রাজসভা থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো বনহুর আর রহমান। আপন মনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল তারা। বনহুর আর রহমানের পেছনে কিছুটা দূরত্ব রেখে এগিয়ে আসছে যুবতী ও তার বৃদ্ধ পিতা।

রাজবাড়ি ছেড়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে তারা।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ ও সেই সঙ্গে আর্তনাদ শুনে ফিরে তাকাল বনহুর আর রহমান। একি! পথের বুকে মুখে থুবড়ে পড়ে গেছে যুবতীর পিতা বৃদ্ধ চাষী।

বনহুর আর রহমান দ্রুত এগিয়ে গেল, নিকটে পৌঁছে বিস্ময়ে হতবাক হলো। বৃদ্ধের বুকে একট গুলি এসে বিদ্ধ হয়েছে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে পথের খানিকটা অংশ।

বনহুর বলে ওঠে—মঙ্গলসিন্ধ তার অপমানের প্রতিশোধ নিল।

রহমান বললো—সর্দার, একি তাহলে রাজকুমার মঙ্গল সিন্ধের কাজ?

হ্যাঁ রহমান, এটা তারই কাজ।

যুবতী তখন পিতার বুকে আছড়ে পড়ে কাঁদছে।

অল্পক্ষণেই লোকজন জড়ো হয়ে গেল সেখানে। কিন্তু সেই অজ্ঞাত খুনীর সন্ধান কেউ পেল না।

বাগানবাড়ি। মঙ্গলসিন্ধের আমোদকক্ষ।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং পাশাপাশি আসনে উপবিষ্ট। সামনে দু'জন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক দণ্ডায়মান। ভয়ংকর চেহারা, বলিষ্ঠ মাংসপেশী।

লাল টকটকে চোখ দুটো। পরনে টানাডোরা কাটা জামা ও খাকী হাফ প্যান্ট। মাথায় এক আংগুল লম্বা ছাঁটা চুল। দেখলেই মনে হয় শয়তানের সহোদর।

মঙ্গলসিন্ধ বলে উঠল—এ অপমানের প্রতিশোধ আমি চাই। প্রকাশ্য রাজদরবারে আমাকে অপমান! কিছুতেই আমি বরদাশ্‌ত করতে পারব না।

কঙ্কর সিং বলে ওঠে—সমস্ত দোষ ঐ শয়তান ভীল সর্দারটার। ওর জন্যই তো এ অপমান!

মঙ্গলসিন্ধ বলে উঠল—যেমন করে হোক ঐ ভীল সর্দারের মাথা আমি নেব। নইলে আমার নাম মঙ্গলসিন্ধ নয়।

এবার গুণ্ডালোক দুটিকে দেখিয়ে বলল কঙ্কর—এদের আদেশ করো মঙ্গল, এরাই তোমার কার্য সিদ্ধ করে দেবে, চাই শুধু টাকা!

গুণ্ডাদের মধ্যে বেশি মোটা লোকটা বলে উঠল—হুজুর, শুধু আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করছি, হুকুম করুন এখনই ভীল সর্দারের মাথা এনে দিচ্ছি।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—কত টাকা নেবে তোমরা?

গুণ্ডাদের হয়ে জবাব দিল কঙ্কর—বেশি না, পাঁচ হাজার দিও।

পাঁচ হাজার, তার চেয়েও বেশি দেব কঙ্কর, তবু ওদের মাথা চাই!

কঙ্কর গুণ্ডাদের দিকে তাকিয়ে একটা ইংগিত করল।

এবার গুণ্ডা লোকটা বলে উঠল—হুজুর, কিছু টাকা অগ্রিম দিতে হবে, গরীব মানুষ আমরা—

বেশ এই নাও, এতে এক হাজার টাকা আছে। মঙ্গলসিন্ধ পকেট থেকে একতোড়া নোট বের করে লোকটার হাতে দিল।

লোক দুটি বেরিয়ে গেল এবার।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—কঙ্কর, বুড়ো বাবা টাকা-পয়সার দিকে এবার কড়া নজর দিয়েছে। সিন্দুকের চাবি এখন তিনি নিজের কাছে রাখেন।

কঙ্কর হেসে উঠল—এই কথা? আচ্ছা তোমাকে একটা বুদ্ধি ঠাওরে দিচ্ছি।

কঙ্কর মঙ্গলসিন্ধের কানে মুখে নিয়ে ফিস ফিস করে কিছু বলল। মঙ্গলসিন্ধের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

❑

গভীর রাত।

রাজপ্রাসাদের পেছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে দোতলার দিকে এগুচ্ছে। মহারাজ জয়সিন্ধের কক্ষের জানালা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল ছায়ামূর্তি, এবার মহারাজ জয়সিন্ধের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে অন্ধকারে তাকালো চারদিকে, তারপর অতি লুঘু হাতে সন্তর্পণে বালিশের তলা থেকে চাবির গোছা তুলে নিল।

এবার ছায়ামুর্তি সিন্দুকের পাশে দাঁড়াল। চাবি দিয়ে খুলে ফেলল সিন্দুকের তালা। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে কয়েক তোড়া নোট তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াল সামনের দিকে।

অমনি ছায়ামূর্তির সামনে একটা জমকালো মূর্তি এসে দাঁড়াল, অন্ধকারেও তার হাতের অস্ত্রটা চক্‌চক্‌ করে উঠল।

চমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ছায়ামূর্তি, দু'চোখে তার ভয় ও বিস্ময়। অন্ধকার হলেও চিনতে বাকী রইলো না জমকালো মূর্তির হাতে রয়েছে সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

জমকালো মূর্তি ছোরাখানা ছায়ামূর্তির বুকে চেপে ধরে বাম হাত মেলে ধরল।

ছায়ামূর্তি যেমন নীরবে টাকার তোড়াগুলো পকেটে রেখেছিল, তেমনি নীরবে বের করে দিল জমকাল মূর্তির হাতে।

জমকালো মূর্তি টাকা নিয়ে নিমেষে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছায়ামূর্তি কিছুক্ষণ থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর দ্রুত পেছনের সিঁড়ি বেয়ে ফিরে চলল।

রাজ প্রাসাদের বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, ছায়ামূর্তি সেই গাড়িতে চেপে বসল।

গাড়ি অদৃশ্য হতেই, সেখানে এসে দাঁড়াল জমকালো মূর্তি। অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল সে—হাঃ হাঃ হঃা—হাঃ হাঃ হাঃ–

❑

ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করছে মঙ্গলসিন্ধ।

একপাশে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে কঙ্করসিং। ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল কঙ্করসিং—কার এত সাহস যে তোমার বুকে ছোরা ধরে টাকাগুলো আত্মসাৎ করে নিল।

মঙ্গলসিন্ধ এবার দাঁড়াল, দাঁত দিয়ে অধর দংশন করে বলল—সে যেই হোক আমি তাকে খুঁজে বের করবই।

এমন সময় মহারাজার বিশ্বস্ত কর্মচারী বঙ্কু রায় এবং নতুন কর্মচারী বিনয় সেন এসে কুর্ণিশ জানাল রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধকে।

মঙ্গলসিন্ধ পিতার কর্মচারীদ্বয়কে এ অসময়ে এখানে দেখে একটু অবাক হবার ভান করে বলল—কি সংবাদ বঙ্কু রায়?

রাজকুমার, খুব দুঃসংবাদ!

দুঃসংবাদ!

হ্যাঁ রাজকুমার, দুঃসংবাদ। আজ রাতে রাজকক্ষ থেকে এক লাখের বেশি টাকা চুরি হয়ে গেছে।

মিছামিছি চমকে ওঠার ভান করে মঙ্গলসিন্ধ একবার বাঁকা চোখে কঙ্কর সিংয়ের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে নিয়ে বলে উঠল—রাজকক্ষে চুরি! বল কি বঙ্কু রায়?

হ্যাঁ কুমার, মহারাজ যখন নিদ্রা যাচ্ছিলেন তখন তাঁর বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে এই চুরি হয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠল মঙ্গলসিন্ধ—আশ্চর্য! এবার চোখ দুটো ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলে উঠল তার, দাঁতে দাঁত পিষে বলল...... কে এই দুর্দান্ত বদমাইস যে ছোরা দেখিয়ে......

আপনি ভুল করছেন কুমার, ছোরা দেখিয়ে নয়.....

হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলে গেছি....তা আমাকে কেন মহারাজ স্মরণ করেছেন বুঝতে পারছি না।

এবার নতুন কর্মচারী বিনয় সেন বলে উঠল—মহারাজ এতগুলো অর্থ হারিয়ে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছেন। পুত্রসঙ্গ তাঁর মনে হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা যোগাবে।

মঙ্গলসিন্ধ নতুন কর্মচারীটির মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

বঙ্কু রায় বলল—কুমার, ইনি রাজবাড়ির নতুন কর্মচারী, নাম বিনয় সেন।

বিনয় সেন বিনীতভাবে পুনরায় কুর্ণিশ জানাল।

মঙ্গলসিন্ধ তীক্ষ্ণ দৃ'ষ্টি নিক্ষেপ করে বিনয় সেনের আপাদমস্তক লক্ষ্য করল। সৌম্য সুন্দর সুপুরুষ যুবক বিনয় সেন! মাথায় কোঁকড়ানো একরাশ চুল। গভীর নীল উজ্জ্বল দুটি চোখ। দীপ্ত সুন্দর মুখমণ্ডল। প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ দেহ, শরীরে রাজকীয় পোশাক!

মঙ্গলসিন্ধ যখন বিনয় সেনকে লক্ষ্য করছিল তখন সে মৃদু মৃদু হাসছিল, অতি স্বাভাবিক সুন্দর সে হাসি!

মঙ্গলসিন্ধের ভাল লাগল যুবক বিনয় সেনকে। এবার সে বঙ্কু রায়কে বলল—যাও তোমরা। আমি আসছি!

বিদায় গ্রহণকালে পুনরায় কুর্ণিশ জানাল বঙ্কু রায় ও বিনয় সেন।

মঙ্গলসিন্ধ কঙ্কর সিংকে বল—সবতো শুনলে কঙ্কর? পিতা আমাকেই হয়তো সন্দেহ করে বসেছেন। নইলে তার কক্ষে প্রবেশের সাহস কার আছে!

কঙ্কর সিং বলল—মিথ্যা ভয়ে ভীত হচ্ছ মঙ্গল! তুমি সরল ভাব নিয়ে যাও সেখানে, তুমি যেন কিছুই জান না এভাবে কথাবার্তা বলবে।

আমার গলাটা কেঁপে যাবে না তো!

এত দুর্বল মন তোমার! রাজকুমার হয়ে এত ভীতু তুমি! সত্যি টাকাটা তো আর তুমি নাওনি।

কিন্তু.....

আর কিন্তু নয় মঙ্গল, যাও।

মঙ্গলসিন্ধ বেরিয়ে গেল।

মহারাজার বিশ্রামকক্ষ।

সিন্দুক থেকে একসঙ্গে এতগুলো টাকা চুরি কম কথা নয়। তাছাড়া রাজকক্ষ থেকে চুরি! মহারাজ জয়সিন্ধ উত্তেজিতভাবে পায়চারী করে চলেছেন।

একপাশে দাঁড়িয়ে রাজার বিশ্বস্ত অনুচরগণ, এমনকি মন্ত্রী সেনাপতি পরিষদ সবাই দণ্ডায়মান। বঙ্কু রায় ও বিনয় সেনও রয়েছে সেখানে। মহারাজ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমার কক্ষে প্রবেশ করে এমন লোক কে আছে রাজ্যে?

সেনাপতি বলে উঠলেন—এত পাহারা সত্ত্বেও চোর স্বচ্ছন্দে এসেছিল এবং কার্যোদ্ধার করে সরে পড়েছে।

এমন সময় রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ রাজকক্ষে প্রবেশ করে পিতাকে কুর্ণিশ জানিয়ে বলল—একি সংবাদ শুনলাম বাবা!

মহারাজ গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে বললো—মংগল, যা শুনেছ তা যতখানি দুঃখের তার চেয়ে ভয়ঙ্কর, আমার রাজ্যে কে এমন আছে যে আমার কক্ষে প্রবেশে সক্ষম হলো?

এ কথা আমিও ভাবছি।

ভাবছি নয়, তাকে তোমাদের আবিষ্কার করতে হবে! এবং সে কারণেই তোমাকে ডেকেছি।

মঙ্গলসিন্ধু বলে উঠল—বাবা, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। আমি শপথ করছি কে এই লোক তাকে খুঁজে বের করবোই।

মঙ্গলসিন্ধের কথায় যোগ দিয়ে বলে উঠল বিনয় সেন—কুমার, আমি আপনাকে এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

মঙ্গলসিন্ধ খুশিভরা দৃষ্টিতে তাকালো বিনয় সেনের দিকে। তার সংগে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

❑

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের দক্ষিণ হাত হয়ে উঠল বিনয় সেন। সব সময় মঙ্গলসিন্ধের পাশে পাশে থাকে সে।

গোপনে নানা সংবাদ সরবরাহ করে।

বিনয় সেনের সহযোগিতায় মঙ্গলসিন্ধ উপকৃত হলো। কৌশলে বিনয় সেন মহারাজাকে বশীভূত করে আরও অর্থ মঙ্গল সেনের হস্তগত করে নিল। এতে আনন্দের সীমা রইলো না মঙ্গলসিন্ধের।

এখন যত গোপন পরামর্শ হয়, সব সময়ে তাদের দলে থাকে বিনয় সেন।

সেদিন বাগানবাড়ির গোপন কক্ষে আলোচনা হচ্ছিল। মঙ্গলসিন্ধ, কঙ্করসিং আর পূর্বের সেই শয়তান গুণ্ডালোক দু'টি এবং বিনয় সেন।

মঙ্গলসিন্ধ গুণ্ডালোক দু'জনকে লক্ষ্য করে বলল—আজও তোমরা ঐ ভীল সর্দার দু'জনকে তাড়াতে পারলে না, অকেজো কোথাকার!

গুণ্ডা লোক দু'টি হাতজোড় করে বলল—কুমার, আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করি না, কিন্তু আজও তাদের...

এতগুলো টাকা খেলে তবু কাজ হাসিল করতে পারলে না। অসমর্থ, অক্ষম—আমার টাকা ফেরত দাও।

বিনীত কণ্ঠে গুণ্ডাদের নেতা লোকটা বলল—আর দুটো দিন আমাদের সময় দেন কুমার বাহাদুর!

বেশ দিলাম এরপর আর ক্ষমা করবো না।

কঙ্করসিং মঙ্গলসিন্ধের কথায় যোগ দিয়ে বলে উঠল—একেবারে খতম করে দিতে পারলে মোটা বখশীস মিলবে।

বহুৎ আচ্ছা হুজুর। সালাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল গুণ্ডাদ্বয়। বিনয় সেন হেসে বলল—কুমার বাহাদুর, ভীল সর্দার দুটিকে যতক্ষণ না তাড়িয়েছেন ততক্ষণ আপনারা নিশ্চিন্ত নন।

হ্যাঁ বিনয়, তোমার কথা সত্য।

❑

সন্ধ্যা থেকে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তৎসঙ্গে দমকা হাওয়াও বইছে। গোটা পৃথিবীটা যেন কোন এক রাক্ষসের সঙ্গে সঙ্গে মত্ত হয়ে উঠেছে।

রাজা জয়সিন্ধের বাগানবাড়ি।

বনহুর আর রহমান পাশাপাশি দু'টি বিছানায় শুয়ে আছে। বনহুর বারবার তাকাচ্ছে দেয়ালঘড়ির দিকে। রাত দ্বিপ্রহর।

রহমান জিজ্ঞাসা করল—সর্দার, আপনাকে আজ বেশ উত্তেজিত লাগছে— নতুন কোন সংবাদ আছে কি?

বনহুর শয্যায় উঠে বসল—আছে। দু'জন গুণ্ডা আমাদের হত্যা করতে আসছে।

সর্দার!

হ্যাঁ রহমান!

ঘাবড়াবার বান্দা রহমান নয়, তবে নিজেদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তো।

বনহুর বাইরে অন্ধকারে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করল। তারপর দ্রুতহস্তে নিজের বালিশগুলো বিছানায় চাদর ঢাকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রহমানকেও ইংগিতে সেই রকম কাজ করার জন্য আদেশ দিল।

এবার বনহুর তার নিজের শয্যার নিচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। রহমানকে আদেশ দিল দরজার আড়ালে দাঁড়াতে।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জানালা খুলে গেল।

রহমান আরও জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল।

মুক্ত জানালা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো যমদূতের মত দু'টি লোক। একজনের হাতে সুতীক্ষ্ণ ঝকঝকে ছোরা—অন্য জনের হাতে একটি তেলপাকা বাঁশের লাঠি।

রহমানের শরীর ফুলে উঠল রাগে কিন্তু সর্দারের বিনা আদেশে সে তো কিছুই করতে পারবে না। কাজেই নিশ্চুপ রইলো।

লোক দু'টির একজন গিয়ে দাঁড়াল রহমানের বিছানার পাশে। লোকটা হাতের লাঠি উঠিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। নড়ে উঠলে বা জেগে গেলে লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী করবে।

দ্বিতীয় লোকটা সুতীক্ষ ধার ছোরা বাগিয়ে বনহুরের বিছানার দিকে এগিয়ে চলল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রহমান দাঁড়িয়ে রইলো।

লোকটা পা টিপে টিপে এগুচ্ছে। তার চোখমুখে খুনের একটা হিংস্রভাব ফুটে উঠেছে।

এবার লোকটা একেবারে বনহুরের শয্যার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিই সেই মুহূর্তে দমকা হাওয়া ভীষণভাবে বইতে শুরু করল। বাইরে গাছপালাগুলো যেন ভেঙ্গে মুচড়ে যাচ্ছে। পাশেই কোথাও বাজ পড়ল।

লোকটা মুহূর্ত বিলম্ব না করে হাতের ছোরাখানা সজোরে বসিয়ে দিল বনহুরের শয্যায় শায়িত লম্বা বালিশে। পর মুহূর্তেই সে তার সঙ্গীকে নিয়ে দুর্যোগময় রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।

বনহুর এবার তার শয্যার নিচে থেকে বেরিয়ে এলো। রহমানও এসে দাঁড়ালোতার অদূরে।

বনহুর হেসে উঠল----- হাঃ হাঃ হাঃ! ভীল সর্দার আজ নিহত হলো রহমান। তারপর এগিয়ে গিয়ে নিজের শয্যার বালিশ থেকে ছোরাখানা টেনে তুলে নিয়ে ফেলে দিল দূরে।

রহমান বলল— সর্দার, ইচ্ছা করলেই তো ওদের আমরা খতম করে দিতে পারতাম।

পারতাম, কিন্তু তা হবে না। আমি চাই আজ থেকে ভীল সর্দারের মৃত্যু হলো। এবার শোনো রহমান?

বলুন সর্দার....

তুমি এক্ষণি রাজপ্রাসাদে যাও, মহারাজার সংগে সাক্ষাৎ করে জানাও তোমার সংগী খুন হয়েছে। কে বা কারা তাকে খুন করেছে এ কথা তুমি জান না। এরপর তুমি তার কাছে বিদায় চেয়ে নেবে এবং যত শীঘ্র পার বজরায় ফিরে যাবে।

আর আপনি?

আমি রাজপ্রাসাদেই থাকব। যখন সময় পাব বা প্রয়োজন মনে করব, বজরায় গিয়ে তোমাদের সংগে সাক্ষাৎ করব। যাও, এই মুহূর্তে গিয়ে রাজপ্রাসাদে সংবাদ দাও তোমার সংগী খুন হয়েছে।

আচ্ছা সর্দার। কিন্তু......

আর কিন্তু নয়।

আপনি....

আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি।

কোথায়?

পরে জানতে পারবে।

❑

দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি হলে কি হবে মঙ্গলসিন্ধের বাগানবাড়ির কক্ষে তখন পুরোদমে নাচগান চলছে! কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল। বাগানবাড়ির অদূরে গাছপালা মড়মড় শব্দে ভেঙ্গে পড়ল তবু বাঈজীর চরণের নূপুরধ্বনি থামল না।

মঙ্গলসিন্ধ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসর জমিয়ে বসেছিল, এমন সময় কঙ্করসিং এবং বিনয় সেন বৃষ্টিতে ভিজে হাজির হলো। মঙ্গলসিন্ধের দলে যোগ দিয়ে আসর সরগরম করে তুলল। মদ পান আর তালিতে মুখর হয়ে উঠল বাগানবাড়ির রঙমহল।

ওদিকে প্রকৃতি ভীষণভাবে তর্জন গর্জন শুরু করেছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বিদুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল ভীল সর্দারের হত্যাকারী গুণ্ডা দু'জন।

মঙ্গলসিন্ধ ইংগিতে গুণ্ডাদ্বয়কে নিকটে আহ্বান জানাল। বলল— খবর কি?

প্রথম গুণ্ডা বলে উঠল—সাবাড় করে দিয়েছি কুমার বাহাদুর!

মঙ্গলসিন্ধ খুশিভরা কণ্ঠে বলল—একেবারে খতম?

হ্যাঁ!

কঙ্করসিং বলল—দু'জনকেই করেছ?

প্রথম গুণ্ডা–না, যাকে বলেছিলেন তাকেই হত্যা করেছি।

বিনয় সেন বলে উঠল—শুভ সংবাদ!

মঙ্গলসিন্ধ বলল—ভুল করোনি তো?

প্রথম গুণ্ডা বলে উঠল—না হুজুর, ভুল করিনি। আমরা আগে সব জেনে নিয়েই কাজ করেছি।

বেশ করেছ। পকেট থেকে একগাদা নোট বের করে মঙ্গলসিন্ধু গুণ্ডাদ্বয়ের হাতে গুঁজে দিল।

বিনয় সেনের মুখে ফুটে উঠল একটু বাঁকা হাসির রেখা!

বেরিয়ে গেল গুণ্ডাদ্বয়।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্করসিং আনন্দ সূচক শব্দ করে উঠল। মঙ্গলসিন্ধ বলল—পথের কাঁটা দূর হলো!

কঙ্কর বলে উঠল—সাপ মেরে লেজ জিইয়ে রাখলে মঙ্গল, ওকেও খতম করা উচিত ছিল।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—কি দরকার! আসল আপদ দূর হয়েছে, ওটাকে আর কেয়ার করি না।

আবার শুরু হলো বাঈজী নাচ।

মঙ্গলসিন্ধের আনন্দ আর ধরছে না। মদের পাত্র হাতে উঠিয়ে নিয়ে একের পর এক উজার করে চলল।

মঙ্গলসিন্ধের সংগে আনন্দে যোগ দিয়ে কঙ্করসিং মাথা দোলাচ্ছে আর করতালি দিচ্ছে।

বিনয় সেনও তাদের সংগে যোগ দিয়েছে।

বৃষ্টি ধরে এসেছে এখন। তবু আকাশে মেঘের ভীষণ ঘনঘটা রয়েছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কিন্তু বাজ পড়েছে না। গাছপালা দুলছে কিন্তু মুচড়ে ভেঙ্গে পড়ছে না।

প্রকৃতি অনেকটা শান্ত আকার ধারণ করেছে।

এমন সময় দু'জন ভীমকায় লোক একটা যুবতীকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। যুবতীর হাত-পা-মুখ কাপড় দিয়ে মজবুত করে বাঁধা। এতটুকু নড়ার শক্তি নেই যুবতীর।

এলোমেলো চুল, ছিন্নভিন্ন বস্ত্রাঞ্চল। যুবতীটাকে মেঝেতে রেখে লোক দুটো সোজা হয়ে দাঁড়াল।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের চোখেমুখে তখন মদের নেশা। মঙ্গলসিন্ধের ইংগিতে বাঈজীর নাচ বন্ধ হলো। বাঈজী একবার রাগতভাবে মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্কর সিংয়ের মুখে তাকিয়ে সরে গেল সেখান থেকে।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—এনেছ?

হ্যাঁ হুজুর এনেছি। বড় বদমাইস ছুকরি, আনতে বড় তকলিফ হয়েছে।

মঙ্গলসিন্ধ একটা উৎকট শব্দ করে উঠল। তারপর ইংগিত করল যুবতীর হাত-পা আর মুখের বাঁধন খুলে দিতে।

কক্ষে অন্য যারা ছিল সবাই বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিনয় সেনও উঠে দাঁড়াল, চলে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতেই মঙ্গলসিন্ধ বলল—আরে, তুমিও যে চললে, এসো এসো....

বিনয় সেন থমকে দাঁড়াল, একবার তাকিয়ে দেখল যুবতীটিকে। নীড়হারা কপোতীর মত থরথর করে কাঁপছে সে।

যুবতীর হাত-পা মুখের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। যুবতী বন্ধনমুক্ত হতেই সোজা হয়ে বসলো। ভয়বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকাল চারদিকে।

কঙ্কর সিং বলে উঠল—একেবারে খাসা মাল?

মঙ্গলসিন্ধের দু'চোখ হতে লালসা ঝরে পড়ছে। যে গুণ্ডাদ্বয় মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল—কুমার বাহাদুর, এর চেয়ে শতগুণ সুন্দরী একটা মেয়ে আছে। কিন্তু.....

কিন্তু কি বলে ফেল বাবা? জড়িত কণ্ঠে বলল মঙ্গলসিন্ধ।

মেয়েটার মূল্য এগুলোর চেয়ে দশগুণ বেশি।

তাতে কি আসে যায়, হেমাঙ্গিনীকে বলো যত চায় তাই দেব, টাকার জন্য ভাবতে হবে না।

আচ্ছা কুমার বাহাদুর।

বেশ, তাহলে যাও এবার তোমরা।

গুণ্ডা দু'জন বেরিয়ে গেল।

বিনয় সেন হঠাৎ বলে উঠল—কুমার বাহাদুর, আমার শরীরটা ভাল বোধ করছি না, আজ বিদায় চাই।

মঙ্গলসিন্ধ টলতে টলতে এগুচ্ছিল যুবতীটার দিকে। বিনয় সেনের কথায় বলে ওঠে–এই খাসা মাল ছেড়ে চলে যাবে? আচ্ছা—যাও তবে।

কঙ্কর সিং তখন ঢেকুর তুলছিল হেউ হেউ করে, এবার বলল—যেতে দাও বন্ধু, সবাইকে চলে যেতে দাও....

বিনয় সেন বেরিয়ে গেল।

দুর্যোগের ঘনঘটা কিছুটা কমে এলেও এখনও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়ের বেগ কমে এলেও দমকা হাওয়া বইছে। বৃষ্টির জলে বাগানবাড়ির পথঘাট একাকার হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তারই আলো বৃষ্টির জলে পড়ে ঝকমক করে উঠছে।

আলখেল্লা গায়ে গুণ্ডা দু'জন এগিয়ে চলছে।

হঠাৎ তাদের সামনে পথরোধ করে দাঁড়াল বিনয় সেন।

চমকে উঠল গুণ্ডারা—দাঁড়িয়ে পড়তেই বিদ্যুতের আলোতে চিনতে পারল তারা বিনয় সেনকে। একজন বলে উঠল—আপনি!

বিনয় সেন একতোড়া নোট বের করে মেলে ধরলো তাদের সম্মুখে, তারপর বলল—আমাকে হেমাঙ্গিনীর নিকটে নিয়ে যেতে হবে। এই নাও তার জন্য প্রথম বখশিস।

প্রথম গুণ্ডা বলল—আপনি কেন কষ্ট করবেন হুজুর, আমরা আপনাদের বান্দা থাকতে----যা বলবেন তাই করব। হাত বাড়িয়ে টাকার তোড়াটা নিল সে, তারপর বলল—ক'টা মেয়ে চান তাই এনে দিতে পারব।

বিনয় সেনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল—পারবে?

পারব।

বিনয় সেন লোক দু'টিকে সঙ্গে করে বাগানবাড়ির অদূরে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। এবার বিনয় সেন গুণ্ডা লোক দুটিকে লক্ষ্য করে বলল—দেখ আমি চাই নিজে গিয়ে যে মেয়েটাকে পছন্দ হয় তাকেই যত টাকা লাগে তাই দেব! আর তোমরাও মোটা বখশিস পাবে।

আচ্ছা হুজুর, তাই হবে। কিন্তু কথাটা আগে হেমাঙ্গিনী দেবীকে জানাতে হবে হুজুর, নইলে আমাদের জান থাকবে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ হুজুর, মেয়েছেলে তো নয় সে, একেবারে মরদের বাবা!

সে আবার কি রকম?

হুজুর, হেমাঙ্গিনী দেবী মেয়েলোকের ব্যবসা করে কিনা, তাই তার ওখানে কোন অপরিচিত লোককে নিয়ে যাওয়া মানা আছে। তবে আপনার জন্য কোন চিন্তা নেই, আপনি তো আর পুলিশের লোক নন।

না না, আমাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। আমি সেখানে যাব এবং পছন্দমত মেয়ে বেছে নিয়ে নগদ টাকা গুণে দেব।

আচ্ছা হুজুর, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি কয়েকদিনের মধ্যে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।

টাকার তোড়াটা পকেটে রেখে চলে যাচ্ছিল গুণ্ডা দু'জন, বিনয় সেন পিছু ডাকে—এই শোন!

বলুন হুজর!

আমি যে তোমাদের দিয়ে অনেক নতুন মেয়ের সন্ধান নিচ্ছি একথা কুমার বাহাদুর যেন জানতে না পারে, বুঝেছ?

বুঝেছি হুজুর, বুঝেছি।

হ্যাঁ, আমার মনমত মেয়ে পেলে তোমাদের অনেক টাকা বখশিস দেব।

আচ্ছা হুজুর। কুর্ণিশ জানিয়ে পুনরায় তাদের গন্তব্যপথে পা বাড়াল ওরা।

বিনয় সেনের চোখ দুটো হঠাৎ আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠল, পকেটে হাত দিয়ে রিভলবারটা মুঠোয় ধরলো সে।

বাগানবাড়ির বাঈজী কক্ষ থেকে তখন একটা নারীকণ্ঠের করুণ তীব্র আর্তনাদ ভেসে আসছিল।

বিনয় সেন মুহূর্ত বিলম্ব না করে রিভলবার হাতে ছুটে চলল দ্রুতগতিতে। অন্ধকার রাতের আবরণে গা ঢাকা দিয়ে বিনয় সেন বাঈজী কক্ষের একটা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কক্ষে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল, সে আলোতে অর্ধমুক্ত জানালা পথে দেখল বিনয় সেন—সেই অসহায় যুবতীটাকে ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত আক্রমণ করেছে মংগলসিন্ধ।

যুবতীর এলোমেলো চুল, শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটিয়ে, জামার হাতা ছিঁড়ে কাঁধের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে।

মাতাল মংগলসিন্ধ জাপটে ধরেছে মেয়েটাকে।

মেয়েটা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করছে সে—বাঁচাও বাঁচাও.....

কিন্তু এই বাগানবাড়ির পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা বদ্ধকক্ষে কে তাকে বাঁচাতে আসবে!

সিংহের মুখে হরিণশিশুর মত ছটফট করছে মেয়েটা!

বিনয় সেন দাঁতে অধর দংশন করল, পরমুহূর্তেই তার হাতের রিভলবার গর্জে উঠল।

সংগে সংগে তীব্র আর্তনাদ করে যুবতীটাকে ছেড়ে দিল মংগলসিন্ধ, তারপর ধপ্ করে বসে পড়ল মেঝেতে।

মংগলসিঙ্কের আর্তনাদে পাশের কক্ষ থেকে শশব্যস্তে ছুটে এলো কঙ্করসিং। মেঝেতে বসে থাকা মংগলসিঙ্ককে দেখতে পেয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেল তার দিকে, জড়িত কণ্ঠে বলল–কি হল বন্ধু? গুলির শব্দ আর তার সঙ্গে তোমার আর্তনাদ আমাকে বড়ই বিচলিত করেছে বন্ধু। একি, রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে! কঙ্কর সিং মঙ্গলসিঙ্কের পায়ের কাছে বসে পড়ল।

ওদিকে যুবতী ছাড়া পেয়ে মুক্ত দরজা দিয়ে দ্রুত ছুটে চলল কিন্তু বাগানবাড়ির বাইরে বের হবার পূর্বে কয়েকজন পাহারাদার যুবতীটাকে ধরে ফেলল।

যুবতী আর্তকণ্ঠে বলল—ছেড়ে দাও, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। যুবতী পাহারাদারগণের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল।

পাহারাদারগণ ইতোপূর্বে গুলির শব্দও শুনতে পেয়েছিল এবং পর পরই যুবতীটাকে পালাতে দেখে পাকড়াও করে ফেলেছিল।

যুবতী এবং পাহারাদারগণ যখন ধস্তাধস্তি করে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের মাঝখানে। প্রচণ্ড এক একটা ঘুষি লাগাতে শুরু করল ছায়ামূর্তি পাহারাদারগণের নাকে-মুখে পেটে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহারাদারগণ যে-যেদিকে পারল ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

ছায়ামূর্তি শুধু দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

অদূরে দাঁড়িয়ে যুবতী হাঁপাচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কে এই অজানা বন্ধু। কে এই মহান ব্যক্তি, এই মহাবিপদ মুহূর্তে বাঁচিয়ে নিল তাকে। ভয়ও হচ্ছে যুবতীর এমন শক্তিমান কে হতে পারে, অতগুলো পাহারাদারকে যে হটিয়ে দিতে পারল!

যুবতী ভারছে কিন্তু এভাবে কতক্ষণ বাগানবাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে তারা। ছায়ামূর্তি এগিয়ে এলো যুবতীর পাশে, বলল–শিগ্গির পালাতে হবে, নইলে আবার ওরা এসে যেতে পারে!

এতক্ষণে সাহস হলো যুবতীর, ছায়ামূর্তি ভূত-প্রেত বা ঐ ধরনের কিছু নয়—সে মানুষ। তাছাড়া ছায়ামূর্তির কণ্ঠস্বর যুবতীর মনে আশ্বস্তি এনে দিল। বলল যুবতী–আপনি কে? আমাকে এই বিপদের সময় বাঁচিয়ে নিলেন?

ছায়ামূর্তি ব্যস্তকণ্ঠে বলল—বলব পরে, এখন চল পালাতে হবে এখান থেকে।

যুবতী বলল–চলুন, কোথায় যাব...

ছায়ামূর্তি যুবতীর হাত ধরে একরকম টেনেই নিয়ে চলল বাগানবাড়ির পেছন দিকে। ছুটতে ছুটতে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ছে যুবতী। একটার পর একটা বিপদ চলছে, তদুপরি গোটা দিন খাওয়া হয়নি। বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল যুবতী।

ছায়ামূর্তি অন্ধকারে ধরে ধরে নিয়ে চলল যুবতীকে।

ততক্ষণে বাগানবাড়ির মধ্যে বেশ হট্টগোল শুরু হয়েছে। আলো জ্বেলে উঠছে একটার পর একটা।

ছায়ামূর্তির মুখের দিকে তাকাল যুবতী—বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল—আপনি!

ছায়ামূর্তি মুখের আবরণ ইতোমধ্যে খুলে ফেলেছিল, বলল–হাঁ, আমাকেই তুমি কিছু পূর্বে কুমার বাহাদুরের বাগানবাড়ির কক্ষে দেখেছিলে, আমার নাম বিনয় সেন!

আপনি ওদের লোক হয়ে....

যাক এখানে বেশি দেরী করা উচিত হবে না, শিগগির বাগানবাড়ির দেয়াল টপকে ওপারে পৌঁছতে হবে।

যুবতী হতাশ কণ্ঠে বলল—তাহলে উপায়? আমি তো অত উঁচুতে উঠতে পারব না।

আমি তোমাকে সাহায্য করব—এসো—বিনয় সেন হাঁটু গেড়ে বসল–আমার কাঁধে পা রেখে দেয়ালের উপর উঠে পড়।

যুবতী নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, একটা ভদ্রলোকের কাঁধে পা রাখা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

বিনয় সেন ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠল—ভাববার সময় নেই বোন, তুমি শিগগির আমার কাঁধে পা রেখে প্রাচীরের উঠে বস।

অজানা-অচেনা একটা যুবকের মুখে মধুর এ বোন সম্বোধন যুবতীর হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করল। অন্ধকারেও যুবতী ভাল করে তাকাল বিনয় সেনের দিকে, তারপর তার কথামত কাজ করল সে।

❑

বাগানবাড়ির বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যুবতী। বিনয় সেন জিজ্ঞাসা করল—কোথায় তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে?

যুবতী ব্যথাকরুণ কণ্ঠে বলল—জানি না।

বিনয় সেন বিস্ময়ভরা গলায় বলল—সেকি, কোথায় যাবে জান না?

না। এদেশে আপনজন আমার কেউ নেই। ওরা আমাকে কান্দাই শহর থেকে ধরে এনেছে। কান্দাইয়ের পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের মেয়ে আমি---.

বিনয় সেন অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল—পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের মেয়ে তুমি!

হ্যাঁ। আমাকে ওরা চুরি করে এনেছে।

আচ্ছা চল আমার সঙ্গে, চিন্তিত হবার কিছু নেই।

আপনি কুমার বাহাদুরের লোক, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আপনি যদি বিপদে পড়েন?

সেজন্য তোমার ভাববার কিছুই নেই সুফিয়া, এস আমার সংগে।

বিনয় সেন আর সুফিয়া হেঁটে এগিয়ে চলল।

রাত ভোর হবার পূর্বেই তাদেরকে শহরের বাইরে পৌঁছতে হবে।

ওদিকে বিনয় সেনের সংগে সুফিয়া যখন পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছে, তখন রাজপ্রাসাদের বাইরে মহা হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। ভীল সর্দারেরবেশে

রহমান হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে–খুন----খুন------আমার বন্ধু খুন হয়েছে!

পাহারাদারগণ রহমানকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, রাত ভোর হতে দাও, রাজাকে বলে একটা ব্যবস্থা কর।

অগত্য ভীল সর্দারবেশী রহমান সিংহদ্বারের পাশে বসে রইল।

ভোর হল।

রাজা জয়সিন্ধ রাজদরবারে এসে বসলেন।

প্রথমেই দরবারকক্ষে হাজির হলো ভীল সর্দারবেশী রহমান— মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে, আমার বন্ধু খুন হয়েছে আপনার বাগানবাড়িতে। আমরা ঘুমিয়েছিলাম, সেই সময় কে বা কারা তাকে খুন করে পালিয়েছে!

মহারাজ জয়সিন্ধের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করলেন মহারাজ–আমার অতিথি খুন! এত সাহস কার যে আমাকে এমন একটা অভিসম্পাতের মুখে ফেলল। মহারাজ জয়সিন্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারি করতে লাগলেন। তিনি অতিথিদের সম্মান বুঝতেন, সকলের আগে অতিথি সেবাই ছিল তাঁর প্রধান ধর্ম।

মহারাজা জয়সিন্ধকে অত্যন্ত উত্তেজিত হতে দেখে ভীল সর্দারবেশী রহমান বলে উঠল—মহারাজ, যা হবার হয়েছে। যে গেছে সে আর ফিরে আসবে না। কাজেই আমি আমার বন্ধুর লাশসহ বিদায় চাই।

মহারাজ জয়সিন্ধ কি আর করবেন— মনের ব্যথা মনে চেপে ভীল-সর্দারকে বিদায় দিলেন।

ভীল সর্দার বিদায় গ্রহণ করতেই একজন রাজকর্মচারী রাজ দরবারে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানাল।

মহারাজার মন তখন বিমর্ষ, ভীল সর্দার বিদায় জানিয়ে বিষণ্ন মনে তার কথা ভাবছেন, রাজকর্মচারীকে জিজ্ঞেসা করলেন–কি খবর মোহন্ত?

মোহন্ত বলে উঠলেন মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে; রাজকুমার আহত হয়েছেন!

মহারাজ জয়সিন্ধ অবাক কণ্ঠে বলেন–রাজকুমার আহত হয়েছে।

হ্যাঁ মহারাজ!

জয়সিন্ধ এবার আপন মনেই বলে উঠলেন—ভীল সর্দার নিহত রাজকুমার আহত—এসব কি শুনছি মোহন্ত?

তাই তো দেখছি মহারাজ।

কুমার এখন কোথায়?

তিনি এখন রাজঅন্তঃপুরে।

কি করে সে আহত হল?

মহারাজ, তিনি শিকারে গিয়ে পায়ে আঘাত পেয়েছেন।

কালই তাকে সন্ধ্যায় আমি দেখেছি, রাতে সে কোথায় শিকারে গিয়েছিল?

মোহন্ত বোবা বনে গেল। তাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিল তাই সে বলেছে। হঠাৎ কোন বুদ্ধি তার মাথায় আসছিল না, মহারাজ জয়সিন্ধ ধমক দিলেন–চুপ করে আছ কেন, বল রাতে সে কোথায় গিয়েছিল?

মোহন্ত আমতা আমতা করে জবাব দিল বোধ হয় বাগানবাড়িতে!

হ্যাঁ এবার আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার বুঝতে পেরেছি আমার অতিথি ভীল সর্দারকে বাগানবাড়িতে কে হত্যা করেছে!

না না মহারাজ, কুমার বাহাদুর তাকে হত্যা করেনি। তাকে হত্যা করেনি।

তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না, যাও—রাজদরবার থেকে বেরিয়ে যাও। পরক্ষণেই সেনাপতিকে লক্ষ্য করে বললেন রাজা জয়সিন্ধ—সেনাপতি, এই মুহূর্তে রাজকুমার মঙ্গল সিন্ধকে বন্দী করে কারাগারে আবদ্ধ করুন।

সেনাপতি উঠে বিনীত কণ্ঠে বলেন—মহারাজ, না জেনে কুমার বাহাদুরকে এভাবে...

যা বললাম আদেশ পালন করুন। বিচারকালে সব চিন্তা করব।

সেনাপতি রাজাদেশ পালন করার জন্য রাজদরবার ত্যাগ করেন।

কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিকসহ কুমার মঙ্গলসিন্ধের কক্ষে প্রবেশ করলেন সেনাপতি এবং অসুস্থ কুমারকে শয্যায় শায়িত দেখে বিনীত কণ্ঠে বললেন—কুমার বাহাদুর আপনি বন্দী!

মঙ্গলসিন্ধ পায়ের ব্যথায় কাতর ছিল, সেনাপতিকে সশস্ত্র সৈনিক সহ তার কক্ষে প্রবেশ করতে দেখেই অনুমানে বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণে তারা এ কক্ষে প্রবেশ করেছে। সেনাপতির কণ্ঠে তার বন্দী হবার সংবাদ জানতে পেয়ে বিস্ময়ভরা গলায় বলল—আমি বন্দী।

হ্যাঁ, কুমার বাহাদুর।

কেন আমি বন্দী জানতে পারি?

রাজার আদেশেই আমি আপনাকে বন্দী করতে এসেছি।

আমার অপরাধ?

অপরাধ বাগানবাড়িতে ভীল সর্দার নিহত।

ভীল সর্দারের খুনের সঙ্গে আমি জড়িত এ কথা কে বলল তাকে?

শুধু জড়িতই নন আপনিই তাকে হত্যা করেছেন বলে মহারাজ সন্দেহ করছেন।

বুঝেছি!

আপনাকে বন্দী করে কারাগারে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ হয়েছে। সেনাপতির ইংগিতে সৈনিকগণ রাজকুমারের হাতে হাত কড়া পরিয়ে দিল।

যদিও রাজকুমারের হাতে হাতকড়া পরাতে সেনাপতির মনে ব্যথা জাগছিল তবু বাধ্য হয়েই এ কাজ করতে হল।

মঙ্গলসিন্ধ বন্দী হয়ে আহত সিংহের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। অজ্ঞাত গুলিটাই তার সর্বকিছু মাটি করে দিয়েছে।

সেনাপতি মঙ্গলসিন্ধকে রাজ কারাগারে বন্দী করে রাখলেন।

❑

সুন্দর বজরায় সুসজ্জিত একটা কক্ষে সুফিয়া বসেছিল। অদূরে দাঁড়িয়ে বিনয় সেন, সুফিয়াকে লক্ষ্য করে বলল শোন, এখানেই আমি থাকি, তুমিও এখানেই থাকবে।

কিন্তু....

কিন্তু কি বোন?

আমার বাবা-মার কাছে কোনদিন আর ফিরে যেতে পারব না?

কেন পারবে না, তুমি নিশ্চিত থাক আমি তোমাকে কান্দাইয়ে পৌঁছে দেব বোন।

বিনয় সেনের মধুর কণ্ঠস্বরে সুফিয়ার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ যেন মানুষ নয়—দেবতা!

সুফিয়া বলে—আপনাকে আমি ভাই বলে ডাকব।

বেশ, ডেক!

বসুন ভাইজান আপনি আমার পাশে, সত্যি আপনাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ জানাব....

বিনয় সেন সুফিয়ার পাশে বসে পড়ল—থাক, বোন হয়ে বড় ভাইকে ধন্যবাদ জানাতে হবে না।

সুফিয়া আনমনে কিছুক্ষণ বজরার মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিনয় সেন বলল—কি ভাবছ সুফিয়া?

ভাবছি অসৎসঙ্গে বাস করেও কি করে আপনি এত মহৎপ্রাণ হতে পেরেছেন!

তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি বলেই যে আমি মহৎপ্রাণ বা উদার ব্যক্তি, এ কথা ভাবা ভুল সুফিয়া। আমি অসৎসঙ্গে বাস করে অসৎব্যক্তিই বনে গেছি, কিন্তু....

না না, ওকথা আমি বিশ্বাস করি না। একটা নারীকে একা অসহায় অবস্থায় পেয়েও যে ব্যক্তি তাকে বোনের সম্মান দিতে পারে সে যে কতবড় উন্নত প্রাণ তা আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

সুফিয়া, তোমার চিন্তাধারা চিরদিন যেন অক্ষয় থাকে। আচ্ছা সুফিয়া, একটা কথা আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করব, ঠিক জবাব দেবে?

একটা কেন, হাজার কথা জিজ্ঞাসা করুন ভাইজান, আমি তার জবাব দেব।

আচ্ছা, তোমাকে যারা চুরি করে এনেছিল তারা কে বা কারা এ সম্বন্ধে কিছু আমাকে জানাতে পার?

হাঁ পারি। আমিও সেই কথা আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম। শুনুন ভাইজান, একদিন আমি আমার এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি ফিরে আসছিলাম–পথের মধ্যে হঠাৎ কয়েকজন লোক আমাকে আক্রমণ করে, গাড়ির ড্রাইভারকে আহত করে আমাকে নিয়ে পালায়। তারা আমার হাত-পা মুখ এমনভাবে বেঁধে ফেলেছিল যে, আমি অনেক চেষ্টা করেও নিজকে ওদের কবল থেকে রক্ষা করতে পারলাম না। আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে নেয়া হল—তারপর আর কিছু স্মরণ নেই আমার! আবার যখন আমার জ্ঞান ফিরে এল তখন নিজেকে একটা নৌকার মধ্যে দেখলাম। আমার হাত পা মজবুত করে বাঁধা রয়েছে। চোখ মেলতেই দেখলাম কয়েকজন ভীষণ চেহারার লোক নৌকার মুখে বসে আছে, লোকগুলো আমাকে দেখে ফিসফিস করে কি যেন বলাবলি করতে লাগল ামি পাশ ফিরলাম, সংগে সংগে বিস্ময়ে হতবাক হলাম–আমার পাশেই আরও কয়েকজন মেয়েকে আমারই মত হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে দেখলাম।

বিনয় সেন তন্ময় হয়ে সুফিয়ার কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল।

সুফিয়া তখনও বলে চলেছে—তারপর আমাদের নৌকা একদিন এই শহরে পৌঁছল। ইতোমধ্যে সবগুলো মেয়েরই জ্ঞান ফিরে এসেছিল। সবাই মাথা কুটে কাঁদাকাঁটি করতে লাগল কিন্তু পাষাণহৃদয় লোকগুলোর প্রাণে এতটুকু মায়া হল না। ঘাটে নৌকা পৌঁছানোর পর রাতের অন্ধকারে আমাদের গাড়িতে করে একটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। তখনও আমাদের হাতগুলো বাঁধা ছিল, পায়ে কোন বাঁধন ছিল না।

বিনয় সেন অস্ফুট কণ্ঠে বলল—তারপর?

তারপর আমাদের সবাইকে সেই বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। রাতের অন্ধকার হলেও আমরা বুঝতে পারলাম শহরের বাইরে কোন পুরোন বাড়ি সেটা।

এখন দেখলে চিনতে পারবে সে বাড়িটা? প্রশ্ন করল বিনয় সেন।

সুফিয়া বলল—না ভাইজান, চিনতে পারব না। কারণ যে অবস্থায় আমি সেই বাড়িতে প্রবেশ করেছিলাম তা ছিল অতি মর্মান্তিক অবস্থা, আমরা সহজে বাড়িটার ভেতরে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলাম না, তাই আমাদের কঠিনভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছিল।

তারপর?

তারপর কি বলব ভাইজান; আমাদের কয়েকজনকে যখন অন্দর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল তখন আমাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। কিন্তু যেখানে আমাদের হাজির করা হল সে এক ভয়ংকর স্থান। কথাটা বলে হাঁপাতে লাগল সুফিয়া। একটু থেমে পুনরায় বলতে শুরু করল—দেখলাম আমাদের সামনে একটা বিরাটদেহ নারীমূর্তি, যেন রাক্ষসী—চোখ দুটো তার আগুনের ভাটা। অনেকক্ষণ ধরে দেখল তারপর একগাদা নোট গুণে দিল যারা আমাদের সকলকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের একজন সর্দার গোঁছের লোকের হাতে। লোকগুলো টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার রাক্ষসী নারীমূর্তি আমাদের নিয়ে যাবার জন্য তার একজন অনুচরকে ইংগিত করল। অদূরে একটা অদ্ভুত বেঁটে মোটা লোক দাঁড়িয়েছিল, সে নাকি সুরে বলল—চল তোমরা!

কি করব আর আমরা, ঐ বেঁটে লোকটাকে অনুসরণ করলাম। এত সহজে আমরা সেখান থেকে যেতাম না! কিন্তু নারীমূর্তির যে রূপ, তাই তাড়াতাড়ি সরে পড়ার জন্য পা বাড়ালাম।

বেঁটে লোকটার সঙ্গে এবার যে কক্ষে প্রবেশ করলাম সে অতি মর্মান্তিক স্থান। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম আমাদেরই মত আরও অনেক মেয়েকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সকলেরই মুখমণ্ডল বিষণ্ন মলিন। চোখ অশ্রু ছলছল। বুঝতে পারলাম ওদেরকেও আমাদের মতই ধরে আনা হয়েছে।

এবার থামল সুফিয়া, কি যেন ভাবল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর বলল—আর কি বলব ভাইজান, এরপর রোজ রাতে লোক আসে আর বেছে বেছে যে মেয়েকে পছন্দ করে তাকে মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যায়, ঠিক ছাগল-ভেড়ার মত। আমাকে একদিন....

বিনয় সেন বলে উঠল—থাক, সব বুঝতে পেয়েছি। দাঁতে দাঁত পিষল বিনয় সেন, দক্ষিণ হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হল; চোখ জ্বলে উঠল ধক্ ধক্ করে।

সুফিয়া অবাক হয়ে তাকাল তার মুখের দিকে, এক অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল তার হৃদয়; নিজের ভাইয়ের পাশে যেন সে বসে রয়েছে।

বিনয় সেন সুফিয়াকে লক্ষ্য করে বলল—সুফিয়া, আমি শপথ করছি, যতদিন আমার বোনদের উদ্ধার করতে না পারব ততদিন আমি নিশ্চিত নই।

আনন্দে অস্ফুটধ্বনি করে উঠল সুফিয়া—ভাইজান।

বিনয় সেন সস্নেহে সুফিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

❑

দস্যু বনহুরের বজরা।

বজরার একটি কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় দস্যু বনহুর। ললাটে তার গভীর চিন্তারেখা, ভ্রূকুটি কুঞ্চিত করে কিছু ভাবছিল সে। কক্ষে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে।

এবার শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল বনহুর, দু'ঠোটের ফাঁকে একটা সিগারেট চেপে ধরে তাতে অগ্নিসংযোগ করল, তারপর পায়চারী শুরু করল বজরার মেঝেতে।

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলল বনহুর— সিগারেটের ধোঁয়ার বজরার ক্যাবিন ধূমায়িত হয়ে উঠল।

এমন সময় নদীতীরে অশ্বপদশব্দ শোনা গেল। বনহুর, হাতের সিগারেটটা বজরার মেঝেতে নিক্ষেপ করে জুতোর গোড়ালি দিয়ে পিষে ফেলল, তারপর জানালা দিয়ে তাকাল নদীতীরে।

সেই মুহূর্তে বজরার কক্ষে প্রবেশ করল রহমান, কুর্ণিশ জানিয়ে বলল—সর্দার, তাজ এসে গেছে।

চল।

বনহুর আর রহমান বজরা থেকে নেমে নদীতীরে এসে দাঁড়াল। আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। নিস্তব্ধ প্রকৃতি। বনহুর তাজের পিঠে বসল, রহমানও তার অশ্বে উঠে বসল, ছুটতে শুরু করল অশ্ব দু'টি।

বালুকাময় নদীতীর বেয়ে বনহুর আর রহমান অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে চলেছে।

বনহুরের দেহে স্বাভাবিক নাগরিক ড্রেস।

রহমানের শরীরেও তাই। কাল অশ্বপৃষ্ঠে সাদা পোশাক পরিহিত যুবকদ্বয় নগরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ঝিন্দ শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা হোটেল। নাম তার 'জানবাগ'। হোটেলটি দিনের বেলায় জাঁকাল না হলেও রাতের বেলা একেবারে গুলজার হয়ে ওঠে। দিনের বেলা জানবাগে কেমন ঝিমাম ঝিমান ভাব থাকে। আর রাতের বেলা তার উলটো।

গাড়িতে গাড়িতে ভরে ওঠে জানবাগের সম্মুখভাগ। কত রকমের গাড়ি— নতুন পুরোন ছোঁট-বড় হরেক রকমের গাড়ি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। শহরের এবং দেশ-বিদেশের বহু রকমের লোকের হয় আমদানি। সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা এদিকে খুব কমই আসে। তবু একেবারে যে আসে না তা নয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় অতি ভদ্রসন্তানও জানবাগে এসে উপস্থিত হয়েছে।

গভীর রাত।

জানবাগ হোটেল এখনও নিশ্চুপ হয়ে পড়েনি। আলোয় আলোময় গোটা হোটেল। হোটেলে ভেতর থেকে তখনও হাসি-গান আর বোতলের টুনটান শব্দ ভেসে আসছে। তার সঙ্গে ভেসে আসছে জড়িত কণ্ঠস্বর।

জানবাগের সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন অশ্বারোহী।

দস্যু বনহুর আর রহমান। অশ্ব থেকে নেমে সোজা তারা হোটেল জানবাগে প্রবেশ করল।

হোটেলে একপাশে তখন তাস পেটাপেটি চলছে, জুয়া খেলছে লোকগুলো। দুটো যুবতী এত রাতেও জুয়াড়ীদের মনে উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে। যুবতীদ্বয় সিগারেট থেকে রাশিকৃত ধূম্রনির্গত করে ছড়িয়ে দিচ্ছিল জুয়াড়ীদের মুখে।

হোটেলের ম্যানেজার একটা চেয়ারে বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। দু' একটা ভদ্রসন্তান এখনও দু'একটা টেবিলে আঁকড়ে বসে আছে। সামনে বিলেতী মদের খালি বোতল আর গ্লাস। হয়তো নেশার মাত্রা বেশি হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসে রয়েছে। কেউ কেউ জড়িত কণ্ঠে গান ধরেছে।

অপরিচিত যুবকদ্বয়কে হোটেলে প্রবেশ করতে দেখে একটা বয় ম্যানেজারকে বলল—স্যার, নতুন লোক এসেছে।

ম্যানেজার চোখ মেলে তাকিয়ে হাই তুলল, তারপর আসন ত্যাগ করে এগিয়ে এল—কি চাই?

বনহুর বলল—আমরা বিদেশী, এই হোটেলে কয়েক দিন থাকতে চাই।

বেশ থাকবেন। তারপর বয়কে লক্ষ্য করে বলল ম্যানেজার—এঁদের ক্যাবিনে নিয়ে যাও।

বনহুর পুনরায় বলে উঠল—আমাদের সংগে দুটো অশ্ব আছে।

ওঃ আচ্ছা, তাদের জন্য আমি আমাদের ঘোড়াশালে জায়গা করে দেব।

বনহুর আর রহমান বয়ের সংগে তাদের নির্দিষ্ট ক্যাবিনে চলে গেল।

বনহুর ও রহমান চলে যেতেই ম্যানেজার এগিয়ে গেল। যে দলটা গোল টেবিলের পাশে বসে তাস খেলছিল, ফিস ফিস করে তাদেরকে কিছু বলল।

সংগে সংগে দু'জন উঠে দাঁড়াল, যে কক্ষে বনহুর আর রহমান বিশ্রামের আয়োজন করছিল সেই কক্ষে প্রবেশ করে বলল— চলিয়ে সাব থোরা খেলোগে?

বনহুর তাকাল লোক দু'টির দিকে, তারপর বলল—বহুৎ আচ্ছা, তুম যাও মায় আতা হুঁ।

লোক দুটি বেরিয়ে গেল।

রহমান বলল—সর্দার, ওদের হাবভাব সুবিধের মনে হচ্ছে না।

হেসে বলল বনহুর-আমাদের হাবভাবই বা এত সুবিধের কোথায়! চল দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।

সর্দার, যে লোক দুটি এখন এসেছিল ওদের একজনকে আমি কোথাও দেখেছি বলে মনে হল।

বনহুর বলল—হাঁ, তাকে কান্দাই শহরে দেখেছ, নাথুরামের ওখানে।

হ্যাঁ সর্দার, এবার মনে পড়েছে, নাথুরামের সহকারী-গোবিন্দনাথ ওর নাম না?

ঠিক চিনতে পেরেছ রহমান। শোন, এই যে দেশব্যাপী নারীহরণ শিশুহরণ চলছে, এ সবের দলপতি ছিল নাথুরাম। নাথুরামের মৃত্যুর পর কান্দাই এবং বিভিন্ন দেশ থেকে নারীহরণ এবং শিশুহরণের হিড়িক কমে যায়নি, নাথুরামের অভাবে তার সহকারী গোবিন্দনাথ এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বনহুরের কথায় রহমান বিস্ময়ভরা গলায় বলল—সর্দার, এত খোঁজ আপনি পেলেন কোথায়?

রহমান, অচিরেই আমি আরও এমন খবর তোমাকে দেব, যা শুনে এবং দেখে তুমি শুধু বিস্মিত হবে না, স্তব্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা চল, ওরা হয়তো আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

বনহুর আগে আগে চলল, রহমান তাকে অনুসরণ করল।

বনহুর এসে দাঁড়াতেই তাকে আসন করে দিল একটা লোক। বনহুর বসে পড়ল।

রহমান দাঁড়িয়ে রইল একপাশে।

খেলা শুরু হল।

যে দু'টি যুবতী এতক্ষণ অন্যান্য পুরুষকে খেলায় উৎসাহ দিচ্ছিল। তারা এবার সরে এসে বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হায় দাঁড়াল।

বনহুর চেয়ারসমেত আরেকটু সরে বসল।

যুবতী পুনরায় ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল, এবার বনহুরের চেয়ারের হাতলে এসে বসলো যুবতী।

বনহুর তখন খেলায় মেতে উঠল।

অল্পক্ষণেই চূড়ান্তভাবে জিতে গেল বনহুর। অবশ্য এর পেছনে ছিল যুবতীদের অদৃশ্য ইংগিত। যদিও যুবতীদ্বয় তাদের দলকে জয়লাভ করার জন্য নিযুক্ত ছিল, কিন্তু আজ যেন তাদের কি হয়ে গেল, বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে তার সর্বনাশ করতে মন তাদের চাইল না।

বনহুর জিতে যেতেই খেলোয়াড়গণের মধ্য থেকে একজন নেতা ধরনের লোক যুবতীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলল—এবার তোমরা যাও।

যুবতীদ্বয় তাদের কথার চাকর, বিনা অনুমতিতে ওখানে থাকতে পারে না, চলে যাবার সময় ওদের প্রথম মেয়েটা বলল—একটা নাচ দেখাব!

রাজী হয়ে গেল লোকটা, অনেকক্ষণ নীরস খেলার মাধ্যমে হাঁপিয়ে উঠছিল ওরা, বলল–আচ্ছা, নাচ দেখাও একটা।

যুবতী সঙ্গে সঙ্গে নাচতে আর গাইতে শুরু করলো।

যুবতী সুন্দরী বটে, নাচটাও তার সুন্দর।

বনহুরকে লোকগুলো পুনরায় খেলার জন্য বললো।

যুবতীটি তখন নাচতে নাচতে গান গইছে। অপূর্ব সুন্দর গানের সুর। মুগ্ধ হল বনহুর, নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইল তার দিকে। ওদিকে লোকগুলো খেলার জন্য বারবার তাকে পীড়াপীড়ি করছে।

যুবতী নাচের মধ্যে ইংগিতে তাকে পুনরায় খেলার জন্য নিষেধ করতে লাগল।

চতুর লোকগুলো যুবতীর ইংগিতভরা নাচ বুঝতে পারল, ধমক দিয়ে নাচ থামিয়ে দিয়ে বলল—যাও।

যুবতীদ্বয় চলে গেল।

বনহুরও উঠে দাঁড়াল, দু'হাতে টাকাগুলো তুলে পকেটে রাখলো।

অন্যান্য খেলোয়াড় তাকাল তাদের দলপতির মুখের দিকে। হুকুম পেলেই আক্রমণ করবে। কিন্তু দলপতি কি যেন ভেবে তখন নিশ্চুপ থাকার জন্য ইংগিত করল।

বনহুর টাকাগুলো পকেটে রেখে চলে গেল নিজেদের নির্দিষ্ট কামরায়। রহমানও সর্দারকে অনুসরণ করল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ভোর হয়ে গেল।

সেদিনের মত কোন ঘটনাই ঘটল না হোটেলে।

বনহুর আর রহমান আজ বের হল না শহরে।

বেলা দ্বিপ্রহরের নির্জন ক্যাবিনে বনহুর শুয়ে শুয়ে কিছু ভাবছে। রহমান বাইরে গেছে কোন কারণে।

এমন সময় পূর্বদিনের সেই যুবতী অতি লঘু পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করল।

বনহুর ফিরে তাকিয়ে কিছুটা অবাক হল, কিন্তু মনোভাব গোপন করে বলল—এস।

যুবতী চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—আপনারা ভদ্রলোক—এ হোটেলে থাকবেন না, এখানে সব সময় বিপদ ঘটতে পারে। আজই চলে যান, দোহাই আপনাদের চলে যান!

হেসে বলল বনহুর—কেন এত ভয় পাচ্ছ! এ হোটেলে এত ভয়ই বা কিসের!

যুবতী এবার বসে পড়ল, বনহুরের বিছানায়, অতি ঘনি/স হয়ে বসল, তারপর বলল আপনাকে ওরা ভাল নজরে দেখছে না। হোটেলের ম্যানেজার আপনার পেছনে ওদের লেলিয়ে দিয়েছে, ওরা আজ রাতে আপনাকে......

যুবতীর কথা শেষ হল না, একটা তীব্র আর্তনাদ করে উবু হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ধরে ফেলল যুবতীটাকে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে তার বুকের বাম পাশটা। একটা পিস্তলের গুলি চলে গেছে যুবতীর বক্ষ ভেদ করে।

যুবতী বনহুরের মুখের দিকে তাকাল, যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল, অতি কষ্টে একটা কথা সে উচ্চারণ করল—আজ রাতে---আপনাকে ওরা খু----আর বলতে পারল না যুবতী, ঢলে পড়ল বনহুরের হাতের ওপর।

বনহুরের দস্যু প্রাণও ব্যথায় গুমরে কেঁদে উঠল। তারই মঙ্গলের জন্য একটা নিরীহ প্রাণ অকালে ঝরে গেল।

বনহুর এবার কালবিলম্ব না করে কম্বলটা দিয়ে যুবতীর রক্তাক্ত মৃতদেহটাকে ঢেকে রেখে উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলো রহমান!

রহমানকে দেখে বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

রহমান বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে এবং মেঝেতে কম্বল ঢাকা কিছু দেখতে পেয়ে বিস্মিত হল, চাপাকণ্ঠে বলল—সর্দার, এর নিচে কি?

বনহুর বলল—কালকের সেই যুবতীর মৃতদেহ।

সর্দার! চমকে উঠল রহমান।

বনহুর তখনও নিশ্চুপ, ব্যথায় মনটা তার টনটন করছিল, কণ্ঠ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না।

রহমান বলল—সর্দার, কে ওকে হত্যা করল?

জানি না।

সে কি সর্দার!

হ্যাঁ রহমান, বেচারী আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল—আজ রাতে আমি খুন হবো-----

সর্দার!

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে হোটেলের ম্যানেজার।

বনহুর তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল বাইরে, ম্যানেজার কিছু বুঝতে পারেনি। তখনকার মত বনহুর নিশ্চিত হল, জিজ্ঞেস করল—হঠাৎ আমার ক্যাবিনে, কি খবর ম্যানেজার সাহেব?

ম্যানেজার একটু আশ্চর্য কণ্ঠে বলল—এদিকে একটা আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল, তাই এলাম খবর নিতে।

বনহুর চট করে বলল—না কিছু না! আমার সঙ্গীটার পায়ে চোট পেয়ে কিছুটা কেটে গেছে তাই।

ওঃ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে চলে গেল ম্যানেজার।

ফিরে এল বনহুর, রহমানকে লক্ষ্য করে বলল—শিগগির এই লাশ সরিয়ে ফেলতে হবে।

রহমান বলল–কিন্তু কি করে তা সম্ভব সর্দার। হঠাৎ কেউ যদি আবার এসে যায়!

তার পূর্বেই কাজ শেষ করতে হবে।

কিন্তু এখানে থাকাটা কি এখন ভাল হবে সর্দার?

পরে চিন্তা করা যাবে। এস কাজ করা যাক!

বনহুর আর রহমান যুবতীর লাশটা মজবুত করে কম্বলে জড়িয়ে বাথরুমে নিয়ে রাখল। তারপর পানি দিয়ে ক্যাবিনের মেঝেটা ধুয়ে ফেলল পরিষ্কার করে।

গোটা দিনটা কেটে গেল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ঝিন্দ শহরের বুকে জ্বলে উঠল অসংখ্য আলোর মেলা। একের পর এক গাড়ি এসে থামতে লাগল জানবাগ হোটেলের সামনে। নানারকমের গাড়ি আর বিচিত্র রকমের মানুষে ভরে উঠল হোটেল জানবাগ।

বনহুরকে রহমান বলল—সর্দার, আজ রাতে এ হোটেল ত্যাগ করতে হবে।

বনহুর বলল—যত সহজ মনে করছ রহমান, তত সহজে এখান থেকে বিদায় নেয়া সম্ভব হবে না।

তাহলে উপায়!

উপায় একটা করতে হবে।

এ খুনের কথা যদি কেউ জেনে ফেলে!

রহমান, তুমি মনে কর এ হত্যার ব্যাপারে হোটেলের কেউ জানে না!

না জানলে খুন হবে কেন, নিশ্চয়ই জানে। তবে এখনও ওরা এ খুন সম্বন্ধে এমন নিশ্চুপ রয়েছে কেন, বুঝতে পারছি না সর্দার।

যুবতীর হত্যারহস্য প্রকাশ পেলে পুলিশের আমদানি হবে এটা এরা চায় না। তা ছাড়া নিজেরাই যখন ওকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়েছে তখন ওদের মাথাব্যাথার কিছু নেই।

তখন ম্যানেজার এসেছিল, সেও তো কিছু বলল না সর্দার।

সব জেনেই না জানার ভান করল। তুমি কি মনে কর ম্যানেজার যুবতীর হত্যা সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

ঐ রকমই তো মনে হল!

ওটা নিছক অভিনয়। চল, দেখা যাক কি হয়!

বনহুর আর রহমান হোটেল কক্ষে প্রবেশ করতেই নজর পড়ল অদূরে উপবিষ্টা পূর্বদিনের সেই যুবতী দু'জনের আরেকজন। চেহারা কেমন যেন বিমর্ষ মলিন, চোখমুখে ফুটে উঠেছে একটা ভয়ার্ত ভাব। সকলের অজ্ঞাতে যুবতী বারবার তাকাচ্ছে বনহুরের দিকে।

বনহুর একবারমাত্র তাকিয়ে যুবতীর দিকে পেছন ফিরে একটা চেয়ার দখল করে নিয়ে বসল। তাকে বাঁচাতে চেয়ে নিরপরাধ একটা জীবন বিনষ্ট হয়েছে। আর নয়, ঐ যথেষ্ট। যুবতী যেটুকু বলে গেছে তাই আত্মরক্ষায় তাকে সতর্ক রাখবে।

বনহুর আসন গ্রহণ করতেই রহমান বনহুরের পেছনে একটি চেয়ারে বসে পড়ল। এদিকে মুখ করে বসলে সর্দারের দৃষ্টির আড়ালে যা ঘটে বা হয় সেটা দেখতে পাবে সে! সতর্ক দৃষ্টি মেলে চারদিকে লক্ষ্য রাখল সে।

হোটেল কক্ষ নানা ধরনের মানুষে ভরে উঠল।

নারীপুরুষ সবাই এসেছে।

হঠাৎ চমকে উঠল বনহুর, হোটেলকক্ষে প্রবেশ করল একটি বিশাল বপুধারিণী নারীমূর্তি। তেলের পিঁপে বললে ভুল হবে না।

রহমান মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসল, সর্দারের দিকে তাকিয়ে দেখল–কিন্তু একি, সর্দারের চোখে একটা তীব্র চাহনি, রহমানও এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগল মহিলাটিকে।

অন্যান্য মহিলার মতই তার হাতে একটি ব্যাগ। কিন্তু ভ্যানিটি ব্যাগ নয়, একটা মস্তবড় চামড়ার ব্যাগ।

মহিলাটি হোটেলকক্ষে প্রবেশ করতেই হোটেলের কর্মচারিগণ শশব্যস্তে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। ম্যানেজার সোজা গিয়ে মহিলাটির হাত চুম্বন করল।

মহিলা এসবে খুশি হল না তেমন। একবার হোটেলকক্ষের চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভেতরের কক্ষে অদৃশ্য হল।

বনহুর পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল মদের দোকানটার পাশে, বলল—ম্যাচটা দাও তো?

মদের বোতল নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল দোকানী, তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে ম্যাচটা বের করে বাড়িয়ে ধরল বনহুরের দিকে।

বনহুর ম্যাচটা হাতে নিয়ে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর বাঁকা চোখে মদের দোকানীর দিকে তাকিয়ে বলল—যে সম্রাজ্ঞী এলেন উনি কে?

দোকানী চাপা গলায় বলল—এই হোটেলের মালিক।

হোটেলের উপযুক্ত মালিকই বটে! বনহুর কথাটা বলে নিজের আসনে গিয়ে বসল।

ততক্ষণে পূর্ব দিনের সেই বিমর্ষমনা যুবতী নাচতে শুরু করেছে।

এদিকে তখন পুরোদমে নাচগান চলছে, হোটেলের প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে মত্ত, ঠিক তখন সকলের অজ্ঞাতে বনহুর উঠে দাড়াল, দ্রুত এগিয়ে চলল সে কক্ষের দিকে, যে কক্ষে একটু পূর্বে ভীমকায় মহিলাটি প্রবেশ করেছে।

বনহুর সেই কক্ষের পাশের কক্ষে প্রবেশ করতেই তার কানে ভেসে এলো হাঁড়ির মত যেন কোন মহিলার কণ্ঠস্বর।

দেয়ালে কান লাগিয়ে দাঁড়াল বনহুর।

পাশের ঘর থেকে শোনা গেল হেঁড়ে গলায় মহিলার সুমিষ্ট ভাষণ–কুমার বাহাদুর জখম হয়েছে, কবে সারবে না সারবে তার জন্য আমি গ্রাহক ভাগিয়ে দেব? এমন মেয়েই নয় হেমাঙ্গিনী।

পরক্ষণেই নরম পুরুষকণ্ঠ–দেখুন হেমাঙ্গিনী দিদি এই সামান্য ক'টা দিন সবুর করুন, কুমার বাহাদুর অনেক করে বলে দিয়েছেন....

রেখে দাও তোমার কুমার বাহাদুর, বেটা পুরুষ নয়–পুরুষের বাচ্চাও নয়। সামান্য পায়ের হাড়ে গুলি লেগেছে তাই মরণ শয্যা নিয়েছে। অমন দশটা গুলি আমার চামড়া কাটতে পারবে না।

দেখুন রাজার ছেলে, তাছাড়া তাদেরই রাজ্যে যখন আমরা বাস করি.....

বাস করি বলেই কি তারা আমাদের নাকে দড়ি লাগিয়ে নাচাবে, সে বান্দা হেমাঙ্গিনী নয়, মনে রেখ কেশব চাঁদ।

বনহুর বুঝতে পারল, এ হোটেলের ম্যানেজারের নাম কেশব চাঁদ।

ওদিকে রহমান পেছন ফিরে হতবাক, এত সতর্ক দৃষ্টির মধ্যেও সর্দার ভেগেছেন। গেলেন কোথায়, রহমান চারদিকে দেখতে লাগল!

এদিক ওদিক লক্ষ্য করতেই কখন যে আবার বনহুর নির্দিষ্ট আসনে এসে বসে নাচ দেখছে লক্ষ্যই করেনি রহমান। এবার অবাক হল, অস্ফুট কণ্ঠে বলল—সর্দার, কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

একটা নতুন কিছু আবিষ্কারে! চুপ, নাচ দেখ।

বনহুর এবার উঠে গিয়ে জুয়ার টেবিলে বসল।

চমকে উঠল রহমান, কিন্তু সে ভয় পেল না। কারণ সে জানে, তাদের সর্দার সবচেয়ে বড় জুয়াড়ী। রহমান গিয়ে দাঁড়াল তার পেছনে, দূর থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল কেউ যেন তার সর্দারকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে।

খেলা চলছে।

রাত বেড়ে আসছে।

একি! সর্দার বার বার হেরে যাচ্ছে। এক হাজার, দু'হাজার তিন হাজার—দশ হাজার।

রহমানের চোখে ধাঁধা লাগছে। এতবার হেরেও তার সর্দার হাসিমুখে খেলে যাচ্ছে–ব্যাপার কি? সর্দার তো কোন দিন পরাজিত হয় না, হলেও তা সে কোন সময় স্বীকার করেন না। জিততেই হবে তার। তারপর টাকা হাতে পেয়ে ছড়িয়ে ফেলে দেবে তাদেরই মধ্যে তবুও পরাজয়ের কালিমা মুখে মাখবে না। রহমান বুঝতে পারে, ইচ্ছা করেই সর্দার আজ পরাজয়ের কালিমা বরণ করে নিচ্ছে।

বনহুরের নিকটে হাজার হাজার টাকা জিতে নিয়ে দুষ্ট লোকগুলো খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল, সবাই বনহুরকে পিঠ চাপড়ে দিল।

নিজের ক্যাবিনে ফিরে আসতেই রহমান বলল—সর্দার, আজ আপনি এমনভাবে নিজেকে-----কথা শেষ না করে মাথা চুলকাতে লাগল সে।

বনহুর বুঝতে পারল কি বলতে চায় রহমান। বনহুর এবার শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল—উপস্থিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য টাকাগুলো ওদের হাতে তুলে দিলাম।

সর্দার!

জানি মৃত্যু সহজ নয়, তবু------যাক রহমান, সেজন্য তুমি ভেব না। জান আজ আমি একটা মস্তবড় সমাধান খুঁজে পেয়েছি। নাও শুয়ে পড় নিশ্চিন্তে। আর কেউ আমাদের আক্রমণ করবে না।

কিন্তু সর্দার, আমার যে চোখে ঘুম আসবে না।

কেন?

এখনও বাথরুমে লাশটা....

ভয় নেই, ও আর জাগবে না। নাও ঘুমাও।

গায়ে চাদর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়ল বনহুর।

রহমানও শুয়ে পড়ল।

❑

এখানে তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো সুফিয়া? বলল বিনয় সেন।

সুফিয়া আজ ক'দিন হল এই বজরায় আশ্রয় পেয়েছে, তারপর থেকে সুফিয়া কোন সময়ের জন্য এতটুকু কষ্ট বা দুঃখ পায়নি। এত সুখ বুঝি তার নিজের বাড়িতেও পায়নি। বিনয় সেনের কথায় বলল সুফিয়া—ভাইজান, আপনার দয়ায় আমি যে কত সুখে আছি তা মুখে বলার ভাষা আমার নেই। অনেক ভাল আছি আমি।

বিনয় সেন এবার বলল–জানি, তোমার মনে একটা কষ্ট অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে। সে হচ্ছে তোমার পিতামাতার নিকটে যাবার ইচ্ছা। বিনয় সেন হেসে বলল—দুঃখ করনা বোন, জানত দুঃখের পর সুখ.....

সে আমি জানি; আপনার মত ভাইজান পেয়েই আমি বুঝতে পেরেছি, দুঃখ শেষ হয়ে এসেছে।

সুফিয়া, এবার শুয়ে পড়; রাত অনেক হল।

ভাইজান, আজ একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, জবাব দেবেন তো?

আজ নয় বোন, অন্য দিন তুমি যা জিজ্ঞাসা করবে তার জবাব পাবে। আজ চলি, ঘুমাও বোন।

আচ্ছা যান আপনি। সুফিয়া বিনয় সেনকে বিদায় দিল।

বিনয় সেন সুফিয়ার কক্ষ থেকে নিজের কক্ষে চলে গেলেও সুফিয়া ঘুমাতে পারল না। আজ প্রায় দু'সপ্তাহ হয়ে এল এই বজরায় আশ্রয় নিয়েছে সে। কিন্তু বজরায় তার কক্ষেই এসে বিনয় সেন সাক্ষাৎ করে যায়। একটি চাকর আছে–সেই খাবার দিয়ে যায়, অন্যান্য যা প্রয়োজন সব সেই চাকরটাই এনে দেয়। এমন কি এখানে তার শাড়ি, জামা-কাপড়, প্রসাধন সামগ্রী সব সে পেয়েছে। কোন অভাবই সে অনুভব করেনি বজরায় বাস করে।

কিন্তু আশ্চর্য, বিনয় সেনকে আজও ভাল করে জানতে পারল না সে। অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে ওঠাবসা করেও মানুষ এত সৎ, এত মহৎ হতে পারে।

নানা চিন্তায় সুফিয়া মগ্ন হয়ে পড়ে। ঘুম তার চোখে আসছে না।

রাত অনেক হয়েছে।

হঠাৎ একটা শিস দেবার শব্দ সুফিয়ার কানে এসে পৌঁছল, চমকে উঠল সুফিয়া–একবার, দু'বার তিনবার ঐ রকম শব্দ। তারপর তার ভাইজান বিনয় সেনের কক্ষের দরজা খোলার শব্দ শুনা গেল।

সুফিয়া আজ স্থির থাকতে পারল না, সে চুপি চুপি নিজের বজরার দরজা সামান্য ফাঁক করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

বিনয় সেন তখন বজরার সিঁড়ি বেয়ে নদীতীরে নেমে যাচ্ছে।

সুফিয়া চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখল বিনয় সেনকে।

নদীতীরে দু'টি লোক তখনও দাঁড়িয়ে আছে, এটাও লক্ষ্য করল সুফিয়া।

বিনয় সেন নদীতীরে পৌঁছতেই লোক দু'টি অভ্যর্থনা জানাল। বজরা থেকে নদীতীর মাত্র কয়েক হাত ব্যবধান। কথাবার্তা সব শোনা যাচ্ছে।

বিনয় সেন বলল—কি হলো, খবর কি!

লোক দু'টির একজন বলল–হুজুর, হেমাঙ্গিনী রাজী হতে চায় না বলে তার ওখানে নতুন মানুষ নিয়ে যাওয়া চলবে না। যেমন খুশি মেয়ে সে আপনাকে দিতে রাজী আছে, যত খুশি পাবেন।

সুফিয়া শিউরে উঠল, নদীতীরের লোকগুলোর কথাবার্তা সব সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। দেব সমতুল্য বিনয় সেনও হেমাঙ্গিনীর শরণাপন্ন। এমন লোকও চরিত্রহীন.... ঘৃণায় সুফিয়ার মন বিষিয়ে উঠল–ছিঃ ছিঃ মানুষ চেনা কঠিন!

এবার কানে ভেসে আসে বিনয় সেনের কণ্ঠ—আমাকে অবিশ্বাসের কিছু নেই। যত টাকা চায় তাই দেব কিন্তু আমার মনমত নারী চাই।

সুফিয়া আর দাঁড়াতে পারল না, মাথাটা তার ঝিম ঝিম করে উঠল, এমন লোকের বজরায় সে বাস করছে। না না, এখানে থাকা আর চলবে না, এমন লোকের বিশ্বাস কি!

এক সময় লোকগুলো চলে গেল।

বজরায় ফিরে এল বিনয় সেন।

পাশের ক্যাবিনে বসে সব টের পেল সুফিয়া। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল গত পনেরটা দিনের কথা। কই একটি দিনও তো বিনয় সেন তার সঙ্গে কোন অসৎ আচরণ করেনি! একা নিঃসঙ্গ পেয়েও কোনদিন এতটুকু কুৎসিত ইংগিত করেনি। আপন বোনের মতই স্নেহ করেছে, ভালবেসেছে সে তাকে!

অনেক ভেবেও সুফিয়ার মন স্বচ্ছ হল না, নিজ কানে সে বিনয় সেনের উক্তিগুলো শুনেছে। ঘৃণায় সুফিয়ার মন তিক্ত হয়ে উঠল।

পরদিন যখন বিনয় সেন সুফিয়ার কামরায় এল তার সঙ্গে দেখা করতে তখন সুফিয়া কিছুতেই বিনয় সেনের সঙ্গে কথা বলতে পারল না। কিছুতেই সে চোখ দুটো তুলে ধরতে পারল না বিনয় সেনের মুখে।

সুফিয়ার আচরণে বিস্মিত হল বিনয় সেন, ভেবে পেল না কি হয়েছে তার।

বিনয় সেন প্রশ্ন করলো—সুফিয়া, তোমার কি কিছু হয়েছে?

সুফিয়া নীরব রইলো, কোন জবাব দিল না।

বিনয় সেন আরও সরে এল সুফিয়ার পাশে, মাথায় হাত বুলিয়ে সন্দেহে বলল–আজ নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে তোমার। ছিঃ, অমন নিশ্চুপ রইলে কেন, বল কি হয়েছে?

সুফিয়া আরও জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল—কি বলবে সে! যা সে নিজ কানে শুনেছে, জেনেছে তা বলার নয়। তবু বলল সুফিয়া—কিছু হয়নি।

বিনয় সেন বলল–মিথ্যে কথা। আমায় লুকোচ্ছ তুমি। ছিঃ আমার কাছে লুকোতে নেই বোন, বল কি হয়েছে তোমার?

আমি এখানে আর থাকতে চাই না।

কেন, কেন বল? ব্যস্তকণ্ঠে বলল বিনয় সেন!

সুফিয়া এবার মুখ তুলে তাকাল বিনয় সেনের দিকে। চট্ করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না সুফিয়া, নীল উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ----কই, সে চোখ দু'টিতে নেই কোন লালসাপূর্ণ চাহনি। পবিত্র নির্মল একটি বলিষ্ঠ মুখ-----হেসে বলল বিনয় সেন–কি দেখছ সুফিয়া?

সুফিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল—ভাইজান, আমাকে মাফ করুন ভাইজান। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

বিনয় যেন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল—কি হল বোন। নিশ্চয়ই তোমার এমন কিছু ঘটেছে যা তোমার মনে অসহ্য বেদনা দিচ্ছে। বল কি হয়েছে?

সুফিয়া দু'হাতের তালুতে মুখ ঢেকে বলে উঠল–আমাকে মাফ করে দিন ভাইজান, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম।

সেকি সুফিয়া!

হ্যাঁ ভাইজান, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। আপনার ফেরেস্তার মত চরিত্র---না না, তা হতে পারে না। ভাইজান, আপনি মানুষ নন, ফেরেস্তা।

সুফিয়া, তোমার কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। হঠাৎ তোমার মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটেছে যার জন্য তুমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছ, আমাকে খুলে বল সুফিয়া?

না না, সে কথা বলতে পারব না ভাইজান। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে, আমি কিছুতেই বলতে পারব না।

কিন্তু বনহুর নিজের কামরায় গিয়ে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না, কি ঘটেছে, যার জন্য সুফিয়া তার সংগে প্রথমে কথাই বলল না– পরে কাঁদল, কি সব আবোল তাবোল বলল, ক্ষমা চাইল, লজ্জার কথা, বলা চলবে না। এসব হেঁয়ালি ভরা কথা—কিছুই বুঝতে পারে না বিনয় সেন।

এরপর থেকে বিনয় সেন সুফিয়ার কক্ষে যাওয়া বন্ধ করে দিল, দূরে থেকে সুফিয়ার সুবিধার দিকে লক্ষ্য করতে লাগল।

সুফিয়া ক'দিনের মধ্যেই বুঝতে পারল, সেদিনের ঘটনার পর বিনয় সেন তাকে যথেষ্ট এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। যদিও এতে সুফিয়ার কোন অসুবিধা হচ্ছিল না তবু মনে শান্তি ছিল না তার। কারণ, আজ সে কোথায় থাকত, কেমন থাকত কে জানে। তার অপবিত্র দেহটা যে এতদিনে শিয়াল কুকুরে খেত না, তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে! ছিঃ ছিঃ কেন সেদিন সুফিয়া তার সঙ্গে অমন আচরণ করেছিল, যার জন্য অমন ফেরেস্তার মত লোকের মনে একটা গভীর সন্দেহের রেখাপাত হয়েছে। সুফিয়া নিজেকে বড়ই লজ্জিত মনে করে।

❑

হেমাংগিনী দেবী তার বিশাল বপু নিয়ে কেবলমাত্র শয্যা গ্রহণ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় গোপীনাথ তার কক্ষে প্রবেশ করে আদাব জানাল।

গোপীনাথকে লক্ষ্য করে বলল হেমাংগিনী—এসেছে নাকি লোকটা?

হাঁ দিদি—এসেছেন তিনি।

দেখ বুঝে-সুঝে কাজ কর, আমার কারবার যেন নষ্ট হয়ে না যায়, তাহলে তোমার কাঁধে মাথা থাকবে না।

সে তো আমি জানি দিদি, আমি কি আর বুদ্ধিহীন। সব দিক ভেবেচিন্তে তবেই কাজ করি।

যাও, বকবক কর না, নিয়ে এস।

আচ্ছা দিদি, এক্ষুণি আনছি।

এই শোন, টাকা-পয়সা কিন্তু একসিকি কম নেব না।

আরে ছোঃ পয়সা কম দেবেন বিনয় সেন, উনি তাহলে রাজকর্মচারী হলেন কেন! বেরিয়ে গেল গোপীনাথ।

একটু পরেই কক্ষে প্রবেশ করলো গোপীনাথ—সংগে বিনয় সেন।

হেমাংগিনী বিনয় সেনকে লক্ষ্য করেই আনন্দে আটখানা হল। বহু লোককে সে জীবনে দেখেছে, জেনেছে.-----কত লোকই না আসে তার এখানে-কত রাজা মহারাজা, কত নবাব বাহাদুর, কত জমিদার, কত প্রজা, কিন্তু এমন সুন্দর চেহারার লোক তো সে কোনদিন দেখেনি। সবাই আসে হেঁইয়া গোঁফ, মাথায় পাগড়ী। কেমন উদ্ভট চেহারা। কেমন নেশায় ঢল ঢল, জড়িত কণ্ঠস্বর-আর এ যে একেবারে যুবরাজ।

হেমাংগিনী সকলের অজ্ঞাতে নিজের শরীরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিল। আঁচলটা যুবতী মেয়েদের মত মাজায় গুঁজে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল এবার-আপনার নামই বুঝি----

হাঁ, আমার নামই বিনয় সেন। আর আপনি বুঝি হেমাংগিনী দেবী?

কোন জবাব না দিয়ে আঁচলের ডগাটা দাঁতে কামড়ে যুবতীদের অনুকরণে মাথাটা দোলাল।

বিনয় সেন বলল—চলুন, যে কারণে এসেছি------

হেমাংগিনী বাঁকা চোখে একটু টিপ্পনী কেটে বলল-এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। সব পাবেন, বসুন না একটু।

বিনয় সেন আসন গ্রহণ করল।

হেমাংগিনী এবার গোপীকে লক্ষ্য করে বলল—তুমি আবার অমন হা করে দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাওনা বেরিয়ে। বখশিস যা দেবার পরে দেব, যাও।

হেমাংগিনী কথাগুলো মোলায়েম সুরেই বলে যেতে চেষ্টা করছিল কিন্তু হঠাৎ তার আসল কণ্ঠ বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে চট করে গলার আওয়াজ মোলায়েম করে নিয়ে বলল—ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মেজাজ ঠিক থাকে না, আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

না না, কিছু মনে করিনি।

গোপীনাথ ততক্ষণে কক্ষ ত্যাগ করেছিল।

বিনয় সেনের যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে একটা পর্বতের পাশে যেন বসে আছে সে। অস্বস্তি বোধ করলেও মুখোভাব স্বাভাবিক রেখে বলল বিনয় সেন—হেমাঙ্গিনী দেবী?

বলুন?

আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

সত্যি!

হাঁ সত্যি, আপনার মত মেয়ে আমি কোথাও দেখেছি কিনা সন্দেহ।

এ্যাঁ কি বললেন?

মানে আপনার মত সুন্দরী মেয়ে-------

সত্যি!

সত্যি নয়তো কি মিছে বলব, তবে আপনার শরীরটা যদি একটু সরু হত তাহলে আপনাকে স্বর্গের অপ্সরী বললে ভুল হত! আহা, কি সুন্দর আপনার চোখ দুটো------

সত্যি!

হাঁ, আপনার ঠোঁট দু'খানা অতি সুন্দর। আপনার ভুরু যেন রামধনু। গোলাপের পাপড়ির মত আপনার চোখের পাতা---

বিনয় সেনের কথায় হেমাঙ্গিনী মোমের মত গলে যাবার উপক্রম হয়। সে পৃথিবীতে আছে না স্বর্গে গেছে ভাবতে পারে না। প্রেম গদগদ হেমাঙ্গিনী বিনয় সেনের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে।

বিনয় সেন ভেতরে ভেতরে বিপদ গুণলেও মুখে হাসি টেনে বলল—চলুন, মেয়েদের কোথায় রেখেছেন দেখাবেন চলুন।

এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বিনয় বাবু? আমার কাছে বসতে বুঝি মন চাইছে না?

ছিঃ ছিঃ ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না হেমাঙ্গিনী দেবী। আপনাকে দেখা অবধি আমি-----আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছি না।

সত্যি বলছেন তো?

আমি মিথ্যা বলি না কোনদিন।

তবে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

ব্যস্ত হইনি তবে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কিনা, পরের চাকরি করি!

আচ্ছা বিনয় বাবু রাজবাড়িতে আপনাকে কত মাইনে দেয়- অবশ্য মনে যদি কিছু না করেন তবেই বলুন?

না না, এতে আবার মনে করার কি আছে? তা রাজবাড়িতে চাকরি করে মাসে পাঁচ শ' টাকা পাই।

ছিঃ ছিঃ এই সামান্য মাইনেতে আপনি কাজ করেন সেখানে?

তাছাড়া আর যে আমার কোন উপায় নেই হেমাঙ্গিনী দেবী।

তবে যে গোপী আমাকে বলেছিল আপনি নাকি অনেক টাকার মালিক?

সে কথা অবশ্য মিথ্যা নয়, যদিও আমি চাকরি করি মাত্র সামান্য টাকায় কিন্তু আমার বাবার অনেক বিষয়-আসয় আছে কিনা। বছরে লাখ দেড় লাখের উপরে পাই।

হেমাঙ্গিনীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল, হেসে বলল—তাহলে চাকরি করার কি দরকার?

ওটা আমার নেশা! বসে থেকে আমার সময় কাটতে চায় না।

তাই চাকরি করি।

আচ্ছা বিনয় বাবু?

বলুন হেমাঙ্গিনী দেবী?

একটা কথা বলব?

স্বচ্ছন্দে বলুন–একটা কেন, হাজারটা বলুন। আপনার কণ্ঠস্বর আমার কানে সুধা বর্ষণ করছে।

সত্যি তো?

একবারই বলেছি মিথ্যা বলা আমার অভ্যাস নয়।

আপনি বড় ভদ্র, আপনার মত লোক আমি কোনদিন দেখিনি।

দাঁতে দাঁত পিষে বলল বিনয় সেন–সেই কারণেই তো আপনি এমন ফেঁপে উঠেছেন....

কি বলেন বিনয় বাবু?

না না, ও কিছু নয়—মানে আপনি বড় অমায়িক মেয়ে, বড় লক্ষ্মী মেয়ে।

হাঁ, আমি লক্ষ্মীই বটে, নইলে দেখছেন না কত বড় বাড়ি, গাড়ি হাজার হাজার কর্মচারী আমার কাজ করছে। শহরে মস্তবড় একটা হোটেল আছে, নাম শুনেছেন বুঝি জানবাগ হোটেলের?

হাঁ শুনেছি, কিন্তু এখনও সেখানে যেতে পারিনি, এটা আমার দুর্ভাগ্য!

ছিঃ ছিঃ, এজন্য দুঃখ করবেন না বিনয় বাবু। আপনাকে আমি সব দেখাব, সব দেখাব–আমার বাড়ির কোথায় কেমন পরিবেশ, সব দেখাব। ও, যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা একেবারে ভুলেই গেছি। বলছিলাম কি জানেন?

বলুন?

মানে আপনি রাজবাড়িতে যখন মোটে পাঁচ শ' পান, আমি যদি আপনাকে তার ডবল দেই মানে এক হাজার?

বিনয় সেন খুশিভরা কণ্ঠে বলে উঠল–এ অধমের প্রতি এত দয়া!

হেমাঙ্গিনী প্রেম গদগদ কণ্ঠে বলল—অধম নন আপনি। আপনি অতি ভাগ্যবান। এক হাজার কেন, আমি আপনাকে আমার যথাসর্বস্ব দেব—অনেক দেব—রাজপুত্রের মত করে রাখব।

বিনয় সেন বিপদ গুণল, হেমাঙ্গিনী তার প্রেম ভিখারিণী। এখন উপায়? যে কাজে সে এখানে এসেছে সব বুঝি পণ্ড হল!

বিনয় সেন উঠে দাঁড়াল—চলুন!

কোথায় যাবেন বিনয় বাবু?

আমি যে কারণে এসেছি।

ও, এখনও আপনি ঐ কথাই ভাবছেন? বেশ চলুন, কিন্তু একটা কথা আমার রাখতে হবে।

বলুন।

আপনাকে সেখানে ছদ্মবেশে যেতে হবে।

কেন? অবাক কণ্ঠে বলল বিনয় সেন।

হেমাঙ্গিনী মৃদু হেসে বলল–আপনার ঐ সুন্দর রাজপুত্রের মত চেহারা দেখলে আমার সবগুলো মেয়েই....

ও, বেশ তো আমি ছদ্মবেশেই যাব।

আসুন আমার সঙ্গে।

হেমাঙ্গিনী বিনয় সেনকে নিয়ে একটা কক্ষে প্রবেশ করল। বিনয় সেন বেশ ঘাবড়ে উঠছিল, হেমাঙ্গিনী আবার তাকে এখানে নিয়ে এল কেন।

হেমাঙ্গিনী বলে উঠল–এটা আমার ছদ্মবেশ কক্ষ! এখানে আপনি ইচ্ছামত চেহারা পালটে নিতে পারেন। চলে যাচ্ছিলো হেমাঙ্গিনী, পুনরায় ফিরে এসে বলল–শুনুন, আপনি কিন্তু বেশ বুড়োর ড্রেস পরে নেবেন।

আচ্ছা। হেসে বিনয় সেন দরজা বন্ধ করল।

ড্রেসিং কক্ষ থেকে যখন বিনয় সেন বের হলো তখন সে সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ। যদিও তার চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে, তবু তাকে দেখলে মনে হচ্ছে যেন কোন সম্ভ্রান্ত ধনবান ব্যক্তি। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, গোঁফ-দাড়ি রুচিসম্মত। শরীরে পাজামা আর পাঞ্জাবী। হাতে রূপোর বাঁটওয়ালা ছড়ি।

হেমাঙ্গিনীর সামনে এসে দাঁড়াল প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বেশে বিনয় সেন।

খুশি হলো হেমাঙ্গিনী, আনন্দভরা কণ্ঠে বলল—হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। আসুন আমার সঙ্গে।

বিনয় সেন হেমাঙ্গিনীকে অনুসরণ করল।

হেমাঙ্গিনী তার বিশাল বপু নিয়ে হাতির মত দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল আর বিনয় সেন চারদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার পেছনে পেছনে এগুতে লাগল।

নারীহরণকারীদের গোপন আস্তানাই বটে। বাড়িটা বহুকালের পুরান হলেও এখনও কোথাও ভেঙ্গে খসে পড়েনি বা ধ্বসে যায়নি।

অনেকগুলো কক্ষ পেরিয়ে হেমাঙ্গিনী একটা ছোট্ট কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়াল। দিনের বেলাও বেশ অন্ধকার। হেমাঙ্গিনী সুইচ টিপে আলো জ্বালল। এবার বিনয় সেন দেখল কক্ষটা সিঁড়িঘর।

বেশ সরু ধরনের একটা সিঁড়ি সোজা নেমে গেছে নিচের দিকে। হেমাঙ্গিনী আর বিনয় সেন সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

সিঁড়িটা বেশ ঘুরে ঘুরে নিচের দিকে নেমে গেছে। সিঁড়িতেও আলো ছিল। কাজেই নামতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না বিনয় সেনের।

সিঁড়িমুখে পৌঁছে হেমাঙ্গিনী দেবী থমকে দাঁড়াল। সিঁড়ির শেষে একটা দরজা রয়েছে। দরজায় মস্তবড় একটা তালা আটকান। হেমাঙ্গিনী কোমর থেকে একগোছা চাবি বেছে নিল, তারপর তালাটা খুলে ফেলল। বিনয় সেন সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কিন্তু কক্ষটা জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিছুই দেখতে পেল না সে। হেমাঙ্গিনী এবার বিনয় সেনকে তার সঙ্গে আসার জন্য ইংগিত করল।

বিনয় সেন বলল—ঐ অন্ধকারে কোথায় যাব হেমাঙ্গিনী দেবী?

আসুন, আলো জ্বেলে দিচ্ছি। হেমাঙ্গিনী অন্ধকারে প্রবেশ করে দরজার পাশেই দেয়ালে হাত রেখে সুইচ টিপল, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষটা আলোময় হলো।

বিনয় সেন কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেল, কক্ষের ওপাশে আর একটা লোহার দরজা, সেই দরজাতেও মস্তবড় একটা তালা লাগান।

হেমাঙ্গিনী এ তালাটাও পূর্বের ন্যায় অতি স্বচ্ছন্দে খুলে ফেলল।

হেমাঙ্গিনীর সংগে বিনয় সেন কক্ষে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ে আড়ষ্ট হল কয়েকটা যুবতীকে সেই কক্ষে দেখতে পেল। কেউ বা বসে কেউ বা বিছানায় শুয়ে রয়েছে। সকলেরই মুখমণ্ডল বিষণ্ন, মলিন। চোখ বসে গেছে। কেউ কেউ নীরবে কাঁদছে।

হেমাঙ্গিনীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল বিনয় সেন। হেসে বলল হেমাঙ্গিনী—এখন এই ক'টা মাত্র আছে বিনয় বাবু। বাকীগুলো চালান হয়ে গেছে।

হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বিনয় সেন কক্ষে প্রবেশ করতেই যে যুবতীগুলো বিছানায় শুয়েছিল তারা উঠে দাঁড়াল। সকলের মুখেই ফুটে উঠল একটা আতঙ্কের ছাপ। ভয়ে আড়ষ্ট হয় সবাই। বিনয় সেন হেমাঙ্গিনীর পাশে

দাঁড়িয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল! বিনয় সেন বেশ বুঝতে পারল যুবতীগণ তাদের আগমনে ভীত হয়ে পড়েছে–না জানি কার এবার বিপদ আসবে!

বিনয় সেনকে লক্ষ্য করে বলল হেমাঙ্গিনী....পছন্দ হয়?

বিনয় সেন ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল—উঁ হুঁ।

এ কথায় হেমাঙ্গিনী যেন খুশি হয়েছে বলে মনে হল, বলল সে—একটিও না?

বিনয় সেন কোন জবাব না দিয়ে প্রতিটি মেয়ের মুখে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগল। একটি মেয়ে তখনও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল।

বিনয় সেন তার দিকে এগুলো।

হেমাঙ্গিনী অমনি বিনয় সেনের পথ রোধ করে দাঁড়াল। দেখা তো হল, কোন্‌টা চাই বলুন বিনয় বাবু?

ঠিক সেই মুহূর্তে ফিরে তাকাল ঐ যুবতী, যে এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। যুবতী অন্য কেউ নয়, দস্যু বনহুরের প্রিয়তমা–মনিরা।

যুবতী মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই বিনয় সেন ওকে লক্ষ্য করল—চমকে উঠল সে—মুগ্ধ হল, এত সুন্দরী যুবতী রয়েছে এখানে!

হেমাঙ্গিনী বুঝতে পারল, বিনয় সেনের দৃষ্টি মনিরার ওপর পড়েছে। হেসে বলল—ওকে বুঝি পছন্দ হল?

বিনয় সেনের দাড়িভরা মুখে হাসি ফুটে উঠল, মাথা দুলিয়ে বলল—খুব পছন্দ হয়েছে!

হেমাঙ্গিনী বিনয় সেনের কানে মুখ নিয়ে বলল—নাগরাণী!

তার মনে?

মানে ওকে কেউ বাগে আনতে পারে না। সুন্দরী বলে সবাই ওকে পছন্দ করে কিন্তু পরে জান রাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়ে। একজনকে সে খুন করেছে, দু'জনকে করেছে আহত।

তাই নাকি?

হাঁ, সেই কারণেই তো আজও পড়ে আছে। ওর পরে কত এলো কত গেল, তবু সে রয়েছে! এখন যে আসে তার কাছে মূল্য বেশি চাই, কাজেই নিতে পারে না, আমিও খুনের হাত থেকে বেঁচে যাই!

তাহলে তো অমন মেয়েই আমার দরকার। নিরীহ মেয়ে আমার ভাল লাগে না, যেমন আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়। আচ্ছা হেমাঙ্গিনী, ওর জন্য আপনাকে কত দিতে হবে?

তা আপনাকে... মানে আপনার যা খুশি দেবেন।

বিনয় সেন মৃদু হেসে বলল—বিশ হাজার।

এত বেশি!

তার চেয়েও বেশি দিতে রাজী আছি হেমাঙ্গিনী দেবী।

বেশ, কিন্তু দেখবেন খুন-জখম না হয়ে বসেন!

মরতে যখন একদিন হবেই তখন ওসবে আমার ভয় নেই। তা টাকাটা কখন দিতে হবে?

যখন আপনার খুশী।

এই নিন টাকা, আমি সঙ্গেই এনেছি। পকেট থেকে হাজার টাকার কয়েক খানা নোট বের করে হেমাঙ্গিনীর সামনে বাড়িয়ে ধরল।

হেমাঙ্গিনীর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে জ্বলজ্বল করে—একসঙ্গে বিশ হাজার টাকা! হেমাঙ্গিনীর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে জামার ফাঁকে বুকের কাছে রাখল।

মনিরা তখন সব বুঝতে পেরেছে, এবার তারই পালা। চোখে মুখে ফুটে উঠল তার একটা প্রতিহিংসার হিংস্র ভাব।

হেমাঙ্গিনী এবার মনিরার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, গলার স্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে বলল—উনি মস্ত বড়লোক, তোমাকে রাজরাণী করে রাখবেন, যাও-যাও তুমি!

না, যাব না।

কেন বাছা আমাকে বারবার জ্বলচ্ছে? উনি ভদ্র সন্তান, উনি মস্ত ধনবান, উনি অনেক জ্ঞানবান।

তবু আমি যাব না।

দেখ মেয়ে, তুমি আমাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছ, তোমার জন্য আমার অনেক টাকা লোকসানও গেছে। এবার আমি তোমাকে রেহাই দেব না।

আমি যাব না।

তিলে তিলে তোমাকে শুকিয়ে মারব।

মরতেই চাই আমি।

মরতে চাইলেই মরতে দেব? আমার টাকাগুলো জলে ভেসে যাবে, তা হচ্ছে না বাছাধন... এবার বিনয় সেনকে লক্ষ্য করে বলল হেমাঙ্গিনী–আপনার গাড়ি?

বিনয় সেন বলল–বাইরে অপেক্ষা করছে।

হেমাঙ্গিনী হাতে তিনটা তালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনটা যমদূতের মত ভীষণ আকার লোক এসে দাঁড়াল। মনে হলো যেন পাতালপুরী রাজ্য থেকে এল ওরা। হেমাঙ্গিনী বললো– বাইরে অন্ধকারে যে গাড়িটা অপেক্ষা করছে সেইগাড়িতে তুলে দিয়ে এসো।

ভয়ঙ্কর লোক তিনজন এগুলো মনিরার দিকে।

মনিরার মুখমণ্ডল ভয়ার্ত বিবর্ণ হয়ে উঠল, জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল সে।

ভয়ঙ্কর লোক তিনটা যেমনি মনিরাকে ধরতে গেল, অমনি মনিরা আর্তকণ্ঠে বলে উঠল–না, না, আমি যাব না, আমি যাব না, আমাকে তোমরা স্পর্শ কর না।

লোক তিনটা তবু পাকড়াও করার জন্য হাত বাড়াল মনিরার দিকে।

হেমাঙ্গিনী বলে উঠল–দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে গাড়িতে উঠিয়ে দাও।

বিনয় সেন বলে উঠল–থাক, দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে না। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। এই, তোমরা সরে দাঁড়াও। বিনয় সেনের কথায় লোক তিনটি থমকে দাঁড়াল।

বিনয় সেন এবার মনিরার দিকে এগুলো।

মনিরা তাকাল বিনয় সেনের দিকে। দু'চোখে ওর ঝরে পড়ছে ক্রুদ্ধ হিংস্র ভাব।

বিনয় সেন মুহূর্ত বিলম্ব না করে খপ্ করে মনিরার হাত মুষ্ঠিতে চেপে ধরল।

মনিরা অমনি হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু একচুলও হাত নড়াতে পারল না। বিনয় সেন অতি সহজেই মনিরাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

হেমাঙ্গিনী হতবাক হল, যে যুবতীকে একসঙ্গে তিন-চার জন বলিষ্ঠ লোক এতটুকু নড়াতে পারে না, আর কিনা একজন লোক তাকে এভাবে নিয়ে যেতে পারল।

বিনয় সেন মনিরাকে গাড়িতে তুলে নিতেই ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। মনিরা তখনও নিজেকে বিনয় সেনের কবল থেকে বাঁচিয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। গাড়িতে বসেই বিনয় সেন মনিরার মুখে একটা রুমাল বেঁধে দিল যেন সে চিৎকার করতে না পারে। তবু মনিরা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ধস্তাধস্তি করছে দেখে বিনয় সেন তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধল।

গাড়ি চালাচ্ছিল গোপীনাথ।

গাড়ি ছাড়ার পূর্বে গোপীনাথ বিনয় সেনকে জিজ্ঞাসা করল— কোথায় যাবেন হুজুর? রাজবাড়িতে আপনার বাসায়, না আপনার বজরায়।

বিনয় সেন বলল—আমার বজরায়।

গাড়ি শহর ছেড়ে বাইরের পথ ধরে ছুটে চলল।

বিনয় সেন মনিরাকে নিয়ে বিদায় হতেই হেমাঙ্গিনী অন্যান্য মেয়ের দিকে একবার সতৃষ্ণ নজরে তাকাল—এদের বিক্রি করে আর কত হাজার পাওয়া যেতে পারে, এটাই বুঝে ভেবে নিল সে। তারপর কক্ষের দরজায় তালা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে নিজের কক্ষে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। টাকাটা অন্য সময় সুযোগ বুঝি গুণে দেখবে, এখনকার মত রেখে দিল লোহার সিন্দুকে।

হেমাঙ্গিনীর আনন্দ আজ আর ধরে না, আজ তার বাঈজী জীবন সার্থক হয়েছে। বিনয় বাবুর মত একজন সুপুরুষ যুবক তার রূপের প্রশংসা করেছে। আর একটু হলেই তারই প্রেমে পড়ে যেত বিনয় বাবু, কিন্তু ঐ ছুঁড়ীটাই অর বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াল। যাক, তবু তো একসঙ্গে এতগুলো টাকা! হেমাঙ্গিনী আজ নাচতে শুরু করে, জোয়ান থাকতে অনেক প্রে

নেচেছে, কিন্তু সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা। এখনও সে বেশ নাচতে পারত, শুধু শরীরটায় যা মেদ হয়েছে, পা দু'খানা যেন আর নড়তে চায় না এই যা!

❑

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বেশে বিনয় সেন মনিরাকে নিয়ে নিজের বজরায় প্রবেশ করল। মনিরার হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। মুখেও রুমাল বাঁধা। কাজেই মনিরা চিৎকার বা নড়াচড়া করতে পারছিল না। অসহায় মনিরার বুকের মধ্যে ঝড় বইছে। ভয়ঙ্কর একটা কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। এই দুষ্ট শয়তানের কবল থেকে কি করে নিজেকে রক্ষা করবে সেই চিন্তা করতে লাগল। ভাবছে মনিরা—এবার আর ওর রক্ষা নেই, এই বুঝি তার জীবনের শেষ পরিণতি। সে নীড়হারা কপোতীর ন্যায় থর থর করে কাঁপছে।

বিনয় সেন মনিরাকে কক্ষে নিয়ে গিয়ে ওর হাতের এবং মুখের বাঁধন খুলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা সরে দাঁড়াল একপাশে। দু'চোখে তার ঝরে পড়ছে সর্পিনীর মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে, দাঁতে অধর দংশন করে সে।

বিনয় সেন মনিরার দিকে এগুলো না বা তাকে পাকড়াও করলো না, নিস্পন্দ নয়নে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মনিরা অবাক হল লোকটা তার দিকে অমনভাবে তাকিয়ে আছে কেন। রাগও হলো মনিরার, সে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

বিনয় সেন তখনও স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। মনিরার হৃৎপিণ্ড ঢিপ ঢিপ করছে, এই বুঝি তার ওপর হামলা করে বসল, বেশ কিছু সময় কেটে গেল এখনও তো লোকটা কিছু বলছে না বা তাকে কোন রকম বিরক্ত করছে না। ব্যাপার কি? মনে মনে কিছুটা সাহস হল মনিরার, আবার সে তাকাল বিনয় সেনের দিকে। একি এখন প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার দিকে তেমনিভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই লোকটা ভাবছে কোন কথা। হয়ত অনুরোধ জানালে মায়া হতে পারে। হাজার হলেও

বুড়ো মানুষ তো, পিতার বয়সী। কিন্তু এতগুলো টাকা সে আমার জন্য দিয়েছে, এত সহজে ছাড়বে? তবুও যার হৃদয় বলে কিছু আছে সে কোনদিন এত জঘন্য বা হৃদয়হীন হতে পারে না।

মনিরা নিজেকে রক্ষার জন্য ওর পায়ে ধরবে তবুও যদি সে পরিত্রাণ পায়! এবার মনিরা ছুটে গিয়ে বিনয় সেন্রের পা জড়িয়ে ধরল—আমাকে বাঁচান....

বিনয় সেন মনিরাকে দু'হাতে বাড়িয়ে তুলে নিল, গম্ভীর স্থিরকণ্ঠে বলল—ভয় নেই, আমি তোমাকে কোন দুষ্ট মতলবে নিয়ে আসিনি।

মনিরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল বিনয় সেনের মুখের দিকে।

বিনয় সেন বলল—আমি তোমাকে ঐ নর-পিশাচিনীর কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই এভাবে নিয়ে এলাম।

মনিরা এবার বলে উঠল—আপনি এত টাকা আমার জন্য নষ্ট করলেন!

নষ্ট নয়, ও টাকা আমার সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় হয়েছে। তোমাকে দেখে আমার বড় মায়া হল তাই----বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল বিনয় সেনের কণ্ঠ।

মনিরার দু'গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা অশ্রু। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল তার মন, বলল সে—আপনার এ উপকারের কথা জীবনে ভুলব না। জানি না আপনি কে—আপনার পরিচয়ই বা কি, তবু আপনার মহৎ হৃদয়ের যে পরিচয় পেলাম কোনদিন তা আমার মন থেকে মুছে যাবে না।

বিনয় সেন এবার বলল—যদিও আমি ঝিন্দ শহরে বাস করি কিন্তু আমি ঝিন্দের অধিবাসী নই, আমি বিদেশী। আমার নাম বিনয় সেন। উপস্থিত আমি রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত রয়েছি। হাঁ, তুমি আমার এখানে নির্ভয়ে থাকতে পার। পাশের কামরায় তোমার মত আর একজন রয়েছে, সেও গৃহহারা, রিক্তা। আচ্ছা এবার বল তোমাকে কোথায় পৌঁছে দিলে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারবে?

মনিরা কিছুক্ষণ বিষণ্ন বদনে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ব্যথিত কণ্ঠে বলল—কোথায় যাব জানি না।

কেন, তোমার বাবা-মা স্বামী?

বড় অপয়া আমি, আজ আমি সর্বহারা।

ছিঃ দুঃখ করতে নেই, তুমি বস, বসে স্থির হয়ে কথা বল।

বসলো মনিরা। কতদিন পর আজ মনিরা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করল।

বিনয় সেন জিজ্ঞাসা করল—তোমার নাম কি?

আমার নাম মনিরা।

কোথায় বাড়ি তোমার?

কান্দাই শহরে।

সে তো এখান থেকে বহু দূরে।

হ্যাঁ।

সেখানে তোমার কে আছেন?

আমার কেউ নেই, এক মামীমা আছেন।

বেশ, সেখানেই তোমাকে পৌঁছে দেব। কিন্তু দেখ মনিরা, আমার কাছে তুমি কিছু লুকাবে না, আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি।

হ্যাঁ, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার মত হৃদয়বান এ বিশ্বে বুঝি কেউ নেই।

আচ্ছা মনিরা, তোমার একমাত্র মামীমা ছাড়া আর কি কেউ নেই?

সব ছিল, আজ নেই।

তোমার বাবা-মা?

মারা গেছেন।

তোমার ভাই-বোন?

ছিল না।

তোমার স্বামী?

মনিরা নিশ্চুপ হয়ে পড়ল, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার চোখ দিয়ে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বলল—স্বামীর কাছে আমি অবিশ্বাসিনী হয়েছি।

অবিশ্বাসিনী!

হ্যাঁ, আমার স্বামীর মনে একটা মিথ্যা সন্দেহ প্রবেশ করেছিল তারপর থেকে তিনি আর আমার সন্ধান নেননি।

এত হৃদয়হীন তোমার স্বামী! মিথ্যা সন্দেহ করে তোমার মত স্ত্রীর প্রতি যে অবিচার করতে পারে–

না না, আমার স্বামী হৃদয়হীন নন, তিনি অতি মহৎ, অতি মহান-----

নারীমন অমনই হয়, নারীর কাছে স্বামী পরম গুরু তাই তার সকল দোষ স্ত্রীর নিকট মার্জনীয়। কিন্তু আমার কাছে তোমার স্বামী এক পাপীষ্ঠ—শুধু পাপীষ্ঠই নয়— নরপিশাচ-------

না না, ওসব কথা বলবেন না। আমি সব সইতে পারি সব কষ্ট বুক পেতে নিতে পারি কিন্তু আমার স্বামীর নামে কোন কথা সইতে পারি না----- মনিরা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বিনয় সেন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

অনেকক্ষণ কাঁদল মনিরা, তারপর বুকের ভার কিছুটা যেন লাঘব হল, এবার সোজা হয়ে বসল—আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে বলল—আমার স্বামীর কোন দোষ নেই, তিনি যে মুহূর্তে যেমন কথা শুনেছেন তাতে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। আপনি আমার গুরুজন তাই আপনার নিকট আমি সব বলছি—আমার এক ছেলে জন্মেছিল। দুর্ভাগ্য, সন্তানটি যখন আমার পেটে আসে তার কয়েক দিন পরই আমার স্বামী নিরুদ্দেশ হন। তারপর আবার তার সঙ্গে আমার যখন সাক্ষাৎ ঘটে তখন আমার কোলে নবজাত শিশু। এবং যে মুহূর্তে আমার সঙ্গে আমার স্বামীর প্রথম সাক্ষাৎ হল সে মুহূর্তে এক দুষ্ট ব্যক্তি আমার সন্তান সম্বন্ধে কুৎসিত ইংগিত করেছিল, কাজেই তিনি ভুল করেননি।

বিনয় সেন বলল—কিন্তু লোকের কথা শুনেই ওভাবে তোমাকে তার ত্যাগ করা উচিত হয়নি।

ত্যাগ তিনি করেননি, আমার অদৃষ্ট আমাকে এভাবে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে।

তোমার সন্তান এখন কোথায়?

পুনরায় মনিরার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, ধরা গলায় বলল—সে নেই, এক সন্ন্যাসী তাকে নিয়ে গেছে।

কে বলল এ কথা?

ঐ হেমাঙ্গিনী তাকে কাপালিক সন্ন্যাসীর নিকট বিক্রি করেছিল।

বিনয় সেনের মুখমণ্ডল ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল। দু'চোখ দিয়ে নির্গত হতে লাগল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, হেমাঙ্গিনী!

হাঁ, হেমাঙ্গিনী আমাকে আরও দুবার বিক্রি করেছিল কিন্তু খোদা আমার সহায়, তাই আজও আমি নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছি। আমি ইজ্জত বাঁচাতে নরহত্যা করেছি— নিশ্চয়ই একদিন আমার স্বামীর মনের ভুল ভেঙে যাবে। তিনি হয়তো আমার মনের কথা জানতে পারবেন, আমাকে বিশ্বাস করবেন, আমাকে গ্রহণ করবেন।

মনিরার কথায় বিনয় সেনের চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মনিরা বলল—আমার দুঃখে আপনি কাঁদছেন। সত্যি আমি বড় হতভাগী। নইলে অমন স্বামী, অমন সন্তান হারাব কেন?

মনিরা তুমি নিশ্চিন্ত থাক আমি তোমার স্বামীকে খুঁজে বের করব। তাকে সব খুলে বলব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মনিরা।

মনিরা কোন জবাব দিতে পারল না।

বিনয় সেন উঠে দাঁড়াল—আমি চললাম হেমাঙ্গিনীকে তার উচিত সাজা দিতে।

না না, আপনি যাবেন না, আপনি যাবেন না। ওর সঙ্গে পারবেন না। অনেক লোক ওর রয়েছে------

মনিরা তুমি দোয়া কর আমি সব বিপদ যেন হাসিমুখে জয় করতে পারি---কথা শেষ করেই বেরিয়ে গেল বিনয় সেন।

❑

ঝিন্দ পুলিশ অফিস।

পুলিশ অফিসারগণ এবং পুলিশবাহিনীর প্রায় সকলেই ঝিন্দ অধিবাসী। সকলেরই চেহারা বলিষ্ঠ, মজবুত। ঝিন্দবাসীরা প্রায়ই কর্তব্যপরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝিন্দাবাসী প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না বা পিছপা হয় না।

এমন দেশেও রয়েছে অনাচার-অবিচার অত্যাচার-উৎপীড়ন। লোকচক্ষুর অন্তরালে সর্বদা যে কত দুষ্কর্ম সাধিত হচ্ছে তার ঠিক নেই। যেমন আলোর পেছনে অন্ধকারের ঘনঘটা।

ঝিন্দ শহর অতি সুন্দর এবং মনোরম। রাজা জয়সিন্ধের ন্যায়বিচারে এখানে প্রজাগণ সুখে বসবাস করত। কিন্তু সেই ন্যায়বান রাজার অন্যায়বান পুত্র মঙ্গলসিন্ধের দুষ্কর্মে নগরবাসী হাঁপিয়ে উঠল, কিন্তু ভয়ে কেউ কোন কথা বলতে পারত না বা সাহস হত না। রাজা বিচার করতেন রাজদরবারে, আর রাজকুমার নির্যাতন চালাত লোকচক্ষুর অন্তরালে, কাজেই নগরের যত অনাচার অত্যাচার গোপনেই চলতো, বাইরে তেমনভাবে কিছু প্রকাশ পেত না।

গভীর রাত।

পুলিশ ইন্সপেক্টার শ্রী ধনঞ্জয় রায় এবং বড় দারোগা শ্রী বাসুদেব পুলিশ অফিসে বসে কোন গোপন ডায়েরী নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। দু'জন জমাদার ও কয়েকজন পুলিশ থানা ইনচার্জে রয়েছেন। পুলিশগণের হাতে গুলিভরা রাইফেল।

এত রাতে একখানা ট্যাক্সি এসে থামল পুলিশ অফিসের সামনে। নেমে এল বিনয় সেন, এখন তার শরীরে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বেশ নেই। গাড়ি থেকে নেমে সোজা পুলিশ অফিসের দিকে এগুলো একদল পুলিশ জিজ্ঞাসা করল—আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

বিনয় সেন জবাব দিল–রাজবাড়ি থেকে?

রাইফেল নত করে দাঁড়াল পুলিশগণ।

বিনয় সেন পুলিশ অফিসের দরজায় গিয়ে কলিং বেলে চাপ দিল, সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—কে?

বিনয় সেন জবাব দিল–আমি রাজকর্মচারী।

আসুন!

বিনয় সেন পুলিশ অফিসে প্রবেশ করল।

রাজকর্মচারীর আগমনে ধনঞ্জয় রায় এবং বাসুদেব উঠে অভ্যর্থনা জানালেন।

তারপর সকলে আসন গ্রহণ করার পর ধনঞ্জয় রায় জিজ্ঞাসা করলেন—এত রাতে?

বিনয় সেন বলল— অতি গুরুতর খবর, একটা নারীহরণকারী গোপন আস্তানার সন্ধান আমি পেয়েছি।

ধনঞ্জয় রায়, বাসুদেব ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার কিছুদিন যাবৎ নারীহরণকারী দল সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে পড়েছেন, কারণ ইতোমধ্যে ঝিন্দ শহরের কয়েকজন সুন্দরী তরুণী নিখোঁজ হয়েছে। আজও এই ব্যাপার নিয়েই এতক্ষণ ধনঞ্জয় রায় ও বাসুদেবের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল! বিনয় সেনের কথায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ধনঞ্জয় রায়, বললেন—কি করে আপনি ঐ আস্তানার সন্ধান পেলেন?

বিনয় সেন বলল—আমার বোনকে ওরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে উদ্ধার করতে গিয়েই আমি ওদের আস্তানার সন্ধান পেয়েছি। আপনারা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না, এক্ষুণি প্রস্তুত হয়ে নিন। আরও একটা কথা, শুধু হেমাঙ্গিনীর বাড়িতে তার কারবার সীমাবদ্ধ নয়, তার দলবল অনেকেই জানবাগ হোটেলে রয়েছে। এ হোটেলটি হেমাঙ্গিনীর।

ধনঞ্জয় রায় আদেশ দিলেন পুলিশবাহিনীকে তৈরি হয়ে নেবার জন্যে।

অল্পক্ষণেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তৈরি হয়ে নিল।

ধনঞ্জয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে চললেন হেমাঙ্গিনীর বাড়ি অভিমুখে, তাদের সঙ্গে রইল বিনয় সেন।

আর বাসুদেব পুলিশবাহিনীর আর একটা দল নিয়ে চললেন জানবাগ হোটেল অভিমুখে।

নিশীথ রাতের জনহীন পথ বেয়ে সশস্ত্র-বাহিনীসহ কয়েকটা মোটরকার দ্রুত ছুটে চলল।

ধনঞ্জয় রায় সেন দলবল নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন হেমাঙ্গিনীর বাড়ির সামনে। ধনঞ্জয় রায়ের ইঙ্গিতে পুলিশবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর গোটাবাড়ি ঘেরাও করে ফেলল।

কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন ধনঞ্জয় রায়।

বিনয় সেন সেই অবসরে পথে অদৃশ্য হল।

❑

হেমাঙ্গিনী গভীর রাতে সিন্দুক খুলে টাকার অংক মিলিয়ে দেখছে। আজ তার কত টাকা সিন্দুকের টাকার সঙ্গে যোগ হ'ল। হেমাঙ্গিনীর চোখেমুখে আনন্দের দ্যুতি খেলে যাচ্ছে। এতগুলো টাকার মোহ তাকে আনন্দে আত্মহারা করে তুলছে। বার বার টাকার বাণ্ডিলগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল হেমাঙ্গিনীর সামনে। তার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলবার।

হেমাঙ্গিনী চমকে চোখ তুলে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল–কে তুমি?

কঠিন অথচ চাপাকণ্ঠে বলল ছায়ামূর্তি—আমি তোমার মৃত্যুদূত!

ছায়ামূর্তির হাতের রিভলবারের দিকে তাকিয়ে হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেল, ঢোক গিলে বলল—কি চাও?

সমস্ত টাকা!

না না, তা হবে না, প্রাণ দেব তবুও টাকা দেব না—কে তুমি, আমি এখনই পুলিশ ডাকব।

পুলিশ তোমাকে ডাকতে হবে না, এখনই আসবে। শিগ্গির টাকাগুলো আমায় দিয়ে দাও।

না না, দেব না আমি টাকা।

দেখ, চিৎকার করলে এখনই তোমাকে হত্যা করব।

হত্যা!

হাঁ।

হেমাঙ্গিনী অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকাল দরজার দিকে।

ছায়ামূর্তি বললো—কেউ আসবে না। পুলিশ তোমার বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে।

পুলিশ! ভয়ার্ত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করল হেমাঙ্গিনী।

ছায়ামূর্তি বলে উঠল–আমি তোমাকে পুলিশের হাতে দেব না। একটানে হেমাঙ্গিনীকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে রিভলবার চেপে ধরল, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলল—শয়তানী, নারীহরণ করে যে পাপ তুমি করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে আমার হাতেই ভোগ করতে হবে---সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তির হাতের রিভলবার গর্জে উঠল।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল হেমাঙ্গিনী।

ছায়ামূর্তি এবার দ্রুতহস্তে সিন্দুকের তালা খুলে টাকার বাণ্ডিলগুলো জামার চোরা পকেটে লুকিয়ে ফেলল। তারপর বিন্দুকের তালা বন্ধ করে চাবিগোছা ছুঁড়ে ফেলে দিল পাশের জানালা দিয়ে দোতলার নিচে বাগানে। এবার ছায়ামূর্তি রিভলবারখানা গুঁজে দিল প্রাণহীন হেমাঙ্গিনীর হাতের মুঠায়।

তারপর যে পথে ছায়ামূর্তি প্রবেশ করেছিল সেই পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ততক্ষণে পুলিশবাহিনীসহ ধনঞ্জয় রায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে।

ইতোমধ্যে বিনয় সেন এসে দাঁড়াল ধনঞ্জয় রায়ের পাশে।

ধনঞ্জয় রায় বলে উঠল–বাড়ির ভেতর থেকে একটা গুলির শব্দ এল–ব্যাপার কি?

আমিও সেই শব্দ শুনে এদিকে ছুটে এলাম ইন্সপেক্টার সাহেব। চলুনত দেখি।

বিনয় সেন আগে আগে, পুলিশবাহিনী তাকে অনুসরণ করলো।

হেমাঙ্গিনীর কক্ষে প্রবেশ করে স্তম্ভিত হলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায় ও বিনয় সেন। হেমাঙ্গিনীর রক্তাক্ত দেহটা একটা পাহাড়ের মতো মেঝেতে পড়ে আছে। দক্ষিণ হাতে তার রিভলবার এখনও ধরা রয়েছে।

বিনয় সেন বলে উঠল—হেমাঙ্গিনী পুলিশের আগমন জানতে পেরে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করেছে। কিন্তু এখানে আর বিলম্ব নয়, এই মুহূর্তে তার দলবল যারা এ বাড়িতে আছে তাদের পাকড়াও করতে হবে, চলুন।

ধনঞ্জয় রায় হেমাঙ্গিনীর লাশের নিকটে একজন পুলিশ পাহারা রেখে বিনয় সেনের সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

যে কক্ষে হেমাঙ্গিনীর দল নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল প্রথমে সে কক্ষে প্রবেশ করল পুলিশবাহিনী।

পুলিশের দল কাউকে রাইফেলের গুঁতো আর কাউকে বুটের লাথি দিয়ে জাগিয়ে তুলল।

ভীষণ আকার লোকগুলো জেগে উঠে হাবা বনে গেল। প্রত্যেকটা লোকের বুকের কাছে পুলিশবাহিনী রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছে। সবাইকে গ্রেফতার করতে আদেশ দিলেন ধনঞ্জয় রায়। কিন্তু সেই অবসরে গুণ্ডাদের নেতা যে পাশের কামরায় ঘুমাচ্ছিল জেগে উঠেই ব্যাপারটা আঁচ করে নিল, তারপর সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়ল। লোকটার নাম ছিল গহর আলী।

বিনয় সেন কিন্তু গহর আলীকে দেখে ফেলল। এই মুহূর্তে তার পেছনে ধাওয়া করা উচিত মনে করল না সে, কারণ এখন তাকে এখানে বন্দী ঐ মেয়েদের উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত হতে হবে।

পুলিশবাহিনী ততক্ষণে গুণ্ডাদলকে গ্রেফতার করে ফেলেছে!

বিনয় সেন এবার সেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চলল, তার সঙ্গে ধনঞ্জয় রায় ও কয়েকজন পুলিশ।

যুবতীদের বন্দীকক্ষে প্রবেশ করে তাদের উদ্ধার করে নেয়া হল। একটি প্রাণীও এল না আজ পুলিশবাহিনীকে বাধা দিতে। যুবতীগণকে উদ্ধার করে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন ধনঞ্জয় রায়, বিনয় সেনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—আপনার সহায়তায় এত বড় একটা জঘন্য নারীহরণ কারী দলকে অতি সহজে গ্রেফতারে সক্ষম হলাম, সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ বিনয় বাবু!

বিনয় সেন হেসে বলল—আপনার সাহায্য না পেলে আজ আমি কিছুই করতে পারতাম না ইন্সপেক্টার সাহেব, এজন্য আপনাকেও ধন্যবাদ।

ধনঞ্জয় রায় এবং বিনয় সেন যখন নারীহরণকারী গুণ্ডাদলকে গ্রেফতার ও যুবতীগণকে উদ্ধার করে নিয়ে পুলিশ অফিস অভিমুখে ফিরে চললেন, ঠিক তখন জানবাগ হোটেলে ভীষণ লড়াই চলছে। পুলিশবাহিনী আর হেমাঙ্গিনীর গুণ্ডাদল মিলে চলেছে ধস্তাধস্তি—মারামারি।

কয়েকজন গুণ্ডা নিহত আর আহত হল। পুলিশদের মধ্যেও নিহত হল দু'তিনজন। তারপর গুণ্ডাদের পাকড়াও করতে সক্ষম হলো পুলিশবাহিনী। বাসুদেবও আহত হলেন জানবাগ হোটেলের ম্যানেজারের হাতে। ম্যানেজার বাসুদেবকে আহত করে পালাতে যাচ্ছিল কিন্তু সে পালাতে সক্ষম হল না, অজ্ঞাত গুলির আঘাতে নিহত হল।

শেষ পর্যন্ত পুলিশবাহিনী জয়ী হলো, জানবাগ হোটেলের কর্মচারীদের বন্দী করে নিয়ে ফিরে চলল তারা।

■

বনহুর অর রহমান অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে চলেছে।

দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল।

বনহুর বলল—রহমান, জানবাগ হোটেলের ম্যানেজার তাহলে তোমার গুলিতেই নিহত হয়েছে?

হাঁ, সর্দার, দারোগাকে আহত করে ভাগছিল, বেটা, আমি ওকে শেষ করে দিয়েছি।

ভালই করেছ রহমান।

সর্দার, নারীহরণকারী দল নিঃশেষ হল, এবার দেশে ফিরে যাওয়া হোক।

হাঁ, তাই যাব কিন্তু আরও ক'টা দিন আমাকে ঝিন্দে অবস্থান করতে হবে।

কেন সর্দার?

আরও কিছু কাজ বাকী আছে। হেমাঙ্গিনীর সিন্দুক থেকে বহু অর্থ আমি উদ্ধার করেছি, এই অর্থ আমি ঝিন্দের দীন-দুঃখীর মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাই। কারণ, ঝিন্দের টাকা আমি নিয়ে যেতে চাই না।

সর্দার, আপনিই তাহলে হেমাঙ্গিনীকে—

হাঁ রহমান, আমি হেমাঙ্গিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর দক্ষিণ হাত গহর আলী নামে এক ব্যক্তি সে এখনও জীবিত, এখনও পলাতক। যাক, ওকে আমি যেখানেই পাব, চিনতে পারব তাতে কোন সন্দেহ নেই। রহমান, তুমি ছদ্মবেশে ঝিন্দ শহরে দীন-দুঃখীদের মধ্যে সন্ধান নাও সত্যিকার দুঃখী লোক কারা এবং তাদের কি সাহায্য প্রয়োজন, সেই মত তাদেরকে অর্থ সাহায্য করবে।

আচ্ছা সর্দার।

এবার বনহুর তার অশ্বের গতি বাড়িয়ে দিল।

রহমানও সর্দারকে অনুসরণ করল।

ঝিন্দ নদীর বালুকাময় তীর বেয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো দস্যু বনহুর আর রহমানের অশ্ব।

বিনয় সেন এক সময় মনিরার সঙ্গে সুফিয়ার দেখা করার সুযোগ করে দিল।

মনিরাকে দেখামাত্রই সুফিয়া চিনতে পারল। কারণ ওরা একই সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বন্দীখানায় ছিল। মনিরাকে দেখতে পেয়ে সুফিয়া জড়িয়ে ধরল, আনন্দে অধীর হয়ে বলল—তুমি এখানে কি করে এলে?

মনিরা বলল—যিনি তোমাকে এখানে এনেছেন তিনি আমাকেও এনেছেন, তার দয়াতেই আমি হেমাঙ্গিনীর অভিশপ্ত নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। সত্যি বোন, আমরা উভয়েই আজ তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

মনিরা আর সুফিয়ার মধ্যে অনেক দুঃখের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হল। সুফিয়া কি করে দুষ্ট শয়তানদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে; কিভাবে রাজকর্মচারী বিনয় সেন তাকে উদ্ধার করলেন এবং তাকে বোনের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন সব খুলে বলল সুফিয়া মনিরার কাছে।

একেই মনিরা বিনয় সেনের ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিল, সুফিয়ার মুখে তার আরও প্রশংসা শুনে অনেক খুশি হল।

বিনয় সেন এই দুই যুবতীর মধ্যে দেখা দিত দুই আকারে। সুফিয়া জানে, বিনয় সেন সুন্দর সুপুরুষ যুবক। আর মনিরা জানে, বিনয় সেন প্রৌঢ় অমায়িক মহৎ হৃদয় এক ভদ্রলোক।

কিন্তু আসল পরিচয় তার কেউ জানে না—কে এই বিনয় সেন!

পরবর্তী বই

ঝিন্দের রাণী